লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৯ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi

Fortnightly

Since 1922

নবপর্যায় ৮৪ বর্ষ | ১৯ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ | ১৩ রমযান, ১৪৪৩ হিজরি | ১৫ শাহাদাত, ১৪০১ হি. শা. | ১৫ এপ্রিল, ২০২২ ঈসাব্দ

"যে ব্যক্তি রমযানের রাত (ইবাদতে) ঈমানের সাথে এবং নিজেকে নিরীক্ষণ করার নিমিত্তে দাঁড়িয়ে কাটায়, তার পূর্ববর্তী যাবতীয় পাপ মোচন করে দেয়া হয়"

(সহীহ্ বুখারী)

গায়ের আহমদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী

খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের জামা'তের সদস্য সংখ্যা যেহেতু অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বর্তমানে তা হাজার হাজারে গিয়ে উপনীত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা অচীরেই লক্ষ-তে পৌছে যাবে। (এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় তা কোটিতে উপনীত হয়েছে) তাই হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হল, এদের পারস্পরিক ঐক্য বৃদ্ধি করার জন্য, এবং এদের পরিবার পরিজন আর আত্মীয় স্বজনের মন্দ বা কুপ্রভাব থেকে আর মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য ছেলে-মেয়েদের বিবাহের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন।

এ কথা স্পষ্ট, যারা বিরোধী মৌলবীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় বিদ্বেষ, হিংসা আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভূক্ত না হয়, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর এ জামা'ত সম্পদে, জ্ঞানে, কল্যাণে, বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে, পুণ্যের দিক দিয়ে কোন ক্ষেত্রেই এখন তাদের মুখাপেক্ষী নয়, এমনকি তাকওয়া পরায়ণ অসংখ্য লোক এ জামা'তে বিদ্যমান। আর প্রত্যেক ইসলামী গোষ্ঠীর লোক এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না– যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী।

স্মরণ রাখবেন! যারা এমন লোকদের পরিত্যাগ করতে না পারে, তারা আমাদের জামা'তে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য নয়। যতদিন পর্যন্ত পবিত্রতা ও সত্যের জন্য এক ভাই নিজ ভাইকে পরিত্যাগ করতে না পারে, পিতা নিজ পুত্র থেকে পৃথক হতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। অতএব সমস্ত জামা'ত মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হবার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যক।

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা: ৫০-৫১)

সম্পাদকীয়

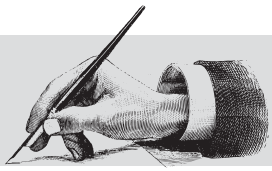

রোযার গুরুত্ব ও কল্যাণ

শর্ত অনুসারে রোযা রেখে কেউ যদি তাকওয়ার উন্নত মানে উপনীত হয় তখন রোযা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার ঢালের নিরাপত্তায় নিয়ে আসে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা ব্যতিরেকে মানুষের প্রতিটি কর্ম তার নিজের জন্য হয়ে থাকে কিন্তু রোযা আমার উদ্দেশ্যে রাখা হয়। অতএব যারা প্রকৃত মু'মিন তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে। আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেছেন, যে আমার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে আমি এর প্রতিদান হয়ে যাই বা আমি তাকে নিজের পক্ষ থেকে যা ইচ্ছা প্রতিদান দিব। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেন, রোযা হল বর্ম। তোমাদের কেউ যদি রোযা রাখে তাহলে সে যেন কামোদ্দীপক কথাবার্তা এবং গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকে। কেউ তাকে গালি দিলে বা তার সাথে কেউ ঝগড়া করলে তার প্রত্যুত্তরে বলা উচিত যে, আমি রোযা রেখেছি তাই আমি কোন প্রকার বাজে বিষয়ে জড়াব না। এটি বর্ণনা করার পর তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যার নিয়ন্ত্রণে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে কস্তুরির চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। মহানবী (সা.) আরও বলেন, রোযাদার ব্যক্তির জন্য দুটি আনন্দ নির্ধারিত রয়েছে। একটি হল সে যখন রোযা খোলে তখন একথা ভেবে আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য ইফতারির ব্যবস্থা করেছেন। আর দ্বিতীয়ত, সে যখন স্বীয় প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন রোযার কারণে আনন্দিত হবে কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমিই এর প্রতিদান বা আমি তাকে প্রতিদান দিব। আর আল্লাহ্ রোযাদারকে যে অনন্ত প্রতিদান দেবেন সেখানে তার আনন্দের চিত্রই হবে ভিন্ন। *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সওম, হাদীস নং ১৯০৪)*

অতএব এটি তাকওয়ার সেই মান যা একজন প্রকৃত মু'মিনের অর্জন করা উচিত। আর প্রকৃত রোযাদার তা অর্জন করেও থাকে। অর্থাৎ রোযা সমস্ত জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত থেকে রাখা উচিত। আর সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থেকে রোযাদার ব্যক্তির দিন কাটানো উচিত। আরেকটি বিষয় হল, মহানবী (সা.) যে বলেছেন, এই মাসে শয়তান শিকলাবদ্ধ হয়ে যায়, এর অর্থ হল, রোযা তাদের জন্য ঢালের কাজ দেয়, শয়তানের হামলা থেকে তাদের রক্ষা করা হয়– যারা রোযার প্রকৃত মর্ম বুঝে তাকওয়া অবলম্বন করে। মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রমযানে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদের শিকলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ কথার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কেউ যদি রমযান পায় আর ক্ষমা লাভে ব্যর্থ হয় তাহলে আর কবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে! অতএব আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আল্লাহ্ রমযানের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা অর্জনের চেষ্টা আমরা করছি কি-না। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তা অর্জনের সৌভাগ্য দিন আর স্বীয় ক্ষমা ও মাগফিরাতের চাদরে আবৃত রাখুন।

সূচিপত্র

১৫ এপ্রিল ২০২২

পবিত্র কুরআন ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

১৬ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৬
বিষয়: ***রমযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য***

১৪ মে, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **ঈদুল ফিতরের খুতবা** ১৮

সীরাতুল মাহদী (আ.) ২৭
[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]
প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)
ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

রমযানের জানা-অজানা ৩১
অনুবাদ: মাওলানা মসীহ্ উর রহমান

বিবাহ সংবাদ ৩৮

সংবাদ ৩৯

কবিতা: স্বাধীন বাংলাদেশ ৩৯
মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৪০

প্রচ্ছদ অলংকরণ:
রবিউল ইসলাম (বাবু)

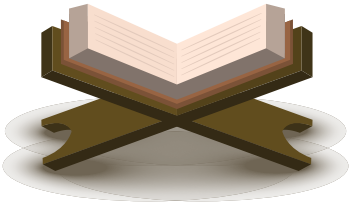

কুরআন শরীফ

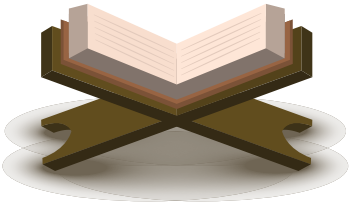

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۴﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۵﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۶﴾ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا
لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾ *(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৪-১৮৭)*

এই আয়াতগুলোর অর্থ হল– হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপরও রোযা রাখা সেভাবেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমারা তাকওয়া অবলম্বন কর, (অতএব তোমরা রোযা রাখ) হাতে গোণা কয়েক দিন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তার অন্যান্য দিনে রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। আর যারা এর (অর্থাৎ রোযা রাখার) সামর্থ্য রাখে না তাদের জন্য (সামর্থ্য থাকলে) ফিদিয়াস্বরূপ একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো আবশ্যক। অতএব যে ব্যক্তি (পূর্ণ আনুগত্যের সাথে) কোন পুণ্যকর্ম করে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম। রমযান মাস হল সেই মাস যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা সঠিক পথের দিশা দেয়। (আর একইসাথে পবিত্র কুরআনে ঐশী নিদর্শনও রয়েছে।) তাই তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এই মাসকে এই অবস্থায় পায় (যে সে অসুস্থও নয় আর মুসাফিরও নয়) তার উচিত সে যেন এতে রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফরে থাকে তার জন্য অন্যান্য দিনে এই গণনা পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য (বা সহজসাধ্যতা) চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। (আর এই আদেশ তিনি এ জন্য দিয়েছেন যেন তোমরা কষ্টের সম্মুখীন না হও) এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর, আর এজন্য আল্লাহ্ তা'লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর কেননা তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, এবং যেন তোমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর (হে রসূল!) আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন বল, আমি তাদের নিকটেই রয়েছি। প্রার্থনাকারী যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করি। তাই সেই প্রার্থনাকারীদেরও উচিত তারা যেন আমার আদেশ মান্য করে এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, যেন তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়।

তফসীরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

উক্ত আয়াতসমূহে (তথা সূরা বাকারার ১৮৪ থেকে ১৮৭ আয়াতে) আল্লাহ্ তা'লা যেসব বিষয় বর্ণনা করেছেন সেগুলো হল, প্রত্যেক মু'মিন এবং প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাহারে কাটানোর নাম রোযা নয়। এর (অর্থাৎ রোযার) মাধ্যমে খোদা তা'লার ইচ্ছা হল, এক খাবার কমিয়ে অপর খাবার বৃদ্ধি করা। রোযাদারের সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে থাকা উচিত যে, এর (অর্থাৎ রোযার) অর্থ শুধু এটিই নয় যে, অনাহারে থাকবে, বরং তার খোদা তা'লার স্মরণে মগ্ন থাকা উচিত যেন তাবাত্তুল ও ইনকিতা অর্জন হয়, অর্থাৎ খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর ইবাদত ও স্মরণের ক্ষেত্রে মানুষ যেন উন্নতি করে আর জগতের প্রতি আকর্ষণ যেন হ্রাস পায়। জাগতিক কাজকর্ম তো লেগেই থাকে, সেগুলো থেমে যায় না, কিন্তু তা করার সময়ও যেন খোদা তা'লাকে স্মরণ রাখা হয়, তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাঁর স্মরণ যেন অব্যাহত থাকে। অতএব রোযার উদ্দেশ্য হল, মানুষের এক খাবার যা দেহের লালন করে তা পরিত্যাগ করে অপর খাবার অর্জন করা যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ হয়। যারা কেবল প্রথাগতভাবে নয় বরং একান্ত খোদার খাতিরে রোযা রাখে তাদের উচিত তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন এবং একত্ববাদের ঘোষণায় ব্যাপৃত থাকা। *(মালফুযাত, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৩)*

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্ তা'লার বাণী পবিত্র কুরআন শরীফ আমাদের সকলেরই নিয়মিত অর্থসহ পাঠ করা উচিত। তবে পবিত্র রমযান মাসে কুরআন পাঠ, অনুধাবন ও চর্চা করার গুরুত্ব অনেক গুণ বেড়ে যায়। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, রমযান মাসে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন,

عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)

অর্থ: "রসূল করীমে (সা.) বলেন, প্রতি বছর রমযান মাসে জিবরাইল (আ.) আমাকে কুরআন (যতটুকু অবতীর্ণ হয়েছিল) একবার পুনরাবৃত্তি করাতেন, তবে এ বছর তিনি দু'বার আমাকে কুরআন পুনরাবৃত্তি করিয়েছেন।"

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রতি বছর এই পবিত্র মাসটা কুরআন রপ্ত ও চর্চা করার জন্য কতটা উর্বর একটি সময়। রমযান মাসে আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত অন্তত একবার পুরো কুরআন অর্থসহ পড়ে শেষ করা। হাদীস শরীফে কুরআন নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানো বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

(সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়িলুল কুরআন)

অর্থ: হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে নিজে কুরআন শেখে ও রপ্ত করে, আর তা অন্যদেরকেও শেখায়।"

এখানে শুধুমাত্র কুরআন শরীফ আক্ষরিক অর্থে শেখানো বা পড়ানো বুঝানো হয় নি, বরং প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনে কুরআনের প্রতিটি শিক্ষার ওপর আমল করার চেষ্টা করা বুঝানো হয়েছে। কুরআনের প্রতি গভীর অভিনিবেশ করে এর তত্ত্বজ্ঞান অনুধাবন করার চেষ্টা করা এবং তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করাকে বুঝানো হয়েছে। যদি এমনটি কেউ করতে সক্ষম হয় বা অন্ততঃপক্ষে আন্তরিকভাবে এমনটি করার চেষ্টা করে, তবে সে বড়ই সৌভাগ্যবান, কারণ মহানবী (সা.) স্বয়ং এমন ব্যক্তির কথা উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

কুরআন শরীফের অংশবিশেষ মুখস্ত ও এর শিক্ষাকে নিজেদের মাঝে ধারণ করা প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

(সহীহ্ তিরমিযি শরীফ, ফাযায়িলুল কুরআন)

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ হৃদয়ে কুরআনের কোন অংশ ধারণ করে না বা কুরআনের কোন অংশই যার মুখস্ত নেই, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।"

শুধুমাত্র কুরআন পাঠ করাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং কুরআনের নির্বাচিত অংশ মুখস্ত করা, তা নিয়মিত নামাযে পাঠ করা ও কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ে লালন করাটাও আবশ্যক।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বা পাঠ করার পদ্ধতিও মহানবী (সা.) আমাদের বলে দিয়েছেন। তবে এর সাথে সাবধানবাণীও রয়েছে।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

(আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুস সালাত)

অর্থ: হযরত সাঈদ বিন আবি সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি নরম সুরে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

এই হাদীস দ্বারা আমরা কেবল কুরআন পাঠ করার গুরুত্বই বুঝতে পারি তা নয়, বরং কুরআন পাঠ করার নিয়মও আমাদের জন্য মহানবী (সা.) বলে দিয়েছেন। নরম সুরে যতটুকু সম্ভব সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা উচিত। এটি পবিত্র কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার দাবী।

আসুন আমরা সবাই এই পবিত্র রমযান মাসে বেশি বেশি কুরআন পাঠ করা, কুরআন মুখস্ত করা ও এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নিয়ে গভীর অভিনিবেশ করার অভ্যাস গড়ে তুলি। এই অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হলে তা পরবর্তী এগার মাসে আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

অমৃতবাণী

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে লিখেন,

মুত্তাকী হওয়ার জন্য আবশ্যক বড় বড় পাপ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে দৃঢ়চিত্ত হওয়া যেমন– ব্যভিচার, চুরি, অধিকার হরণ, লৌকিকতা, কৃত্রিমতা, আত্মশ্লাঘা, মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা, কৃপণতা ইত্যাদি আর নোংরা বা হীন অভ্যাস পরিত্যাগ করে এর বিপরীতে মহান নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে উন্নতি করা, (অর্থাৎ প্রশংসনীয় স্বভাব চরিত্রের অধিকারী হওয়া।) মানুষের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করা, তাদের প্রতি দয়া, সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা। উন্নত নৈতিক গুণাবলী অর্জন করা। খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার বিশ্বস্ততা ও একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করা। এটিও তাকওয়ার জন্য এবং আধ্যাত্মিকতার জন্য আবশ্যকীয় যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার বিশ্বস্ততা থাকে এবং সত্যিকার সম্পর্ক থাকে। আর সেবার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় মর্যাদায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। (আল্লাহ্ তা'লার অধিকারের বিষয়টিও এর অন্তর্গত অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন করা, একইসাথে মানুষের সাথে সম্পর্ক এবং তাদের সেবার বিষয়টিও এর অধীনে আসে। অর্থাৎ সেবা যেন এমন নিঃস্বার্থ হয় যা দেখে মানুষ বলবে যে, আসলেই খোদা তা'লার খাতিরে সেবা করছে। কোন প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ যেন না থাকে।) এসব বিষয়ের মাধ্যমেই মানুষ মুত্তাকী হিসেবে অভিহিত হয়। আর যাদের মাঝে এসব গুণাবলী পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে অর্থাৎ যারা এসব বৈশিষ্ট্যকে সমবেত করে তারাই প্রকৃত মুত্তাকী হয়ে থাকে। অর্থাৎ কারও মাঝে যদি বিচ্ছিন্নভাবে এসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে মুত্তাকী বলা যাবে না, যতক্ষণ উন্নত নৈতিক গুণাবলী সামগ্রিকভাবে তার মাঝে সৃষ্টি না হবে। আর এমন ব্যক্তিদের জন্যই বলা হয়েছে لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (সূরা ইউনূস: ৬৩)। অর্থাৎ তাদের কোন ভয়ও থাকবে না আর তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার এই নিশ্চয়তা লাভের পর তাদের আর কী চাই। আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান, যেমনটি তিনি বলেছেন, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (সূরা আল্ আরাফ: ১৯৭)। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদের হাত হয়ে যান যদ্বারা তারা ধরে, তাদের চোখ হয়ে যান যার দ্বারা তারা দেখে, তাদের কান হয়ে যান যার দ্বারা তারা শোনে, তাদের পা হয়ে যান যার মাধ্যমে তারা চলে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– যে আমার ওলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আমি তাকে বলছি যে, আমার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এক জায়গায় তিনি (সা.) বলেন, যখন কেউ খোদার ওলী বা বন্ধুর ওপর হামলা করে তখন খোদা তা'লা তার ওপর সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন যেভাবে এক সিংহীর কাছ থেকে তার শাবক ছিনিয়ে নিলে সে ক্রোধের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। *(মালফুযাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০০-৪০১)*

১৬ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

রমযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۴﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۵﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۶﴾ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

(সূরা বাকারা: ১৮৪-১৮৭)

উক্ত আয়াতগুলোর অনুবাদ হল:

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য (সেভাবে) রোযা বিধিবদ্ধ করা হল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।"

"(সুতরাং তোমরা রোযা রাখ) হাতেগোনা কয়েকটি দিন মাত্র। তবে

তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে, তাকে অন্য সময়ে (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। আর যারা এর (অর্থাৎ রোযা রাখার) সামর্থ্য রাখে না (তাদের) 'ফিদিয়া' (হল) একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো। অতএব যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাল কাজ করে তা তার জন্য উত্তম। আর তোমরা যদি জানতে (তাহলে বুঝতে পারতে) রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম।"

"রমযান সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন মানবজাতির জন্য এক মহান হিদায়াতরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এমন স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে যাতে হিদায়াতের বিশদ বিবরণ আর সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী বিষয়াবলী রয়েছে। অতএব, তোমাদের মাঝে যে এ মাস পায় সে যেন এতে রোযা রাখে। কিন্তু যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাকে অন্যান্য দিনে (রোযার এ) সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর (তিনি চান) তোমরা যেন (রোযার নির্ধারিত) সংখ্যা পূর্ণ কর। আর তিনি যে তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন সেজন্য তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর; আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

"আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। অতএব, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়।"

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর পুনরায় আমাদের রমযান মাস অতিবাহিত করার সৌভাগ্য হচ্ছে। আমাদের সদা স্মরণ রাখা উচিত, কেবল রমযান মাস লাভ করা এবং এ মাসটা কাটানোই যথেষ্ট নয় অথবা কেবল প্রভাতে সেহেরী খেয়ে রোযা রাখা আর সাঁঝের বেলায় ইফতারি করে রোযা খোলাই রোযার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে না বরং এই রোযার পাশাপাশি আর এই রোযাসমূহের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির আদেশ দিয়েছেন। রোযার বরাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি কতক বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন আর এগুলো মেনে চলার কল্যাণে তিনি আমাদেরকে নিজ নৈকট্য প্রদানের এবং দোয়া গৃহীত হবার সুসংবাদ দিয়েছেন। সেগুলোর কয়েকটি আয়াত আমি তিলাওয়াত করেছি। আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রোযা আবশ্যক হওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অনুরূপভাবে এটিও বলেছেন, যদি অসুস্থতা অথবা অন্য কোন বৈধ কারণ থাকে তাহলে রোযা রাখতে না পারার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে তা পূর্ণ করতে হবে অথবা যদি কেউ একেবারেই রাখতে না পারে, অসুস্থতা দীর্ঘ হয়ে থাকে তবে এর জন্য ফিদিয়া দিতে হবে। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখতে হবে, যদি পরবর্তীতে রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হয় (এবং সে রোযা রাখে) তবুও কারও আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে ফিদিয়া প্রদান করা উত্তম। পুনরায় পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব এবং এর অবতরণ সম্পর্কে উল্লেখ করে আমাদেরকে অবগত করেছেন যে, কুরআন পাঠ করা, এর ওপর আমল করা আমাদের জন্য হিদায়াত ও ঈমানে দৃঢ়তা লাভের মাধ্যম। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার এবং তাঁর প্রেরিত শিক্ষা অনুধাবণেরও মাধ্যম এটি। এরপর পুনরায় আমাদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হে নবী! আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের নিকটে আছি। দোয়া শ্রবণ করি, গ্রহণ করি এবং রমযান মাসে মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা নিম্ন আকাশে নেমে আসেন। অর্থাৎ, তাঁর বান্দাদের দোয়া অনেক বেশি গ্রহণ ও কবুল করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা চাও আমি তোমাদের দোয়া শ্রবণ করি বা কবুল করি তবে তোমাদেরও আমার কথা মানতে হবে। আমি যেসব শিক্ষা প্রদান করেছি এর ওপর আমল করতে হবে। কেবলমাত্র রমযান মাসের জন্যই নয়, বরং স্থায়ীভাবে জীবনের অংশ বানাতে হবে এবং নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করতে হবে। অতএব, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্যও কতিপয় শর্ত আছে। অতএব, আমরা যদি এসব শর্তানুযায়ী নিজেদের দোয়ায় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লাকে নিজেদের নিকটে এবং দোয়া শ্রবণকারী হিসেবে পাব। এখন আমি দোয়ার প্রেক্ষাপটে হযরত মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্বৃতি উপস্থাপন করে দোয়ার গুরুত্ব এবং আমাদের ব্যবহারিক অবস্থায় যে পরিবর্তন আনা উচিত- সে সম্পর্কে দোয়া গৃহীত হওয়ার শর্তাবলী কি এবং এর দর্শন ও এর গভীরতা সম্পর্কে তিনি (আ.) যা বর্ণনা করেছেন সেখান থেকে কিছু উপস্থাপন করব। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যারা ভাসাভাসা ভাবে দোয়া করে আবার বলে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন নি। যেন আল্লাহ্ তা'লাকে আমরা একটি কাজ করতে বলেছি আর তাঁর সেটি মানা উচিত ছিল; যেন নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ্ তা'লা তাদের আদেশ মানতে বাধ্য। যা ইচ্ছা তাই বলবে, যেভাবে চায় সেভাবে বলবে, তাদের কর্ম যেমনই হোক না কেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের কথা শুনতে বাধ্য। আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এমনটি হবে না। প্রথমে তোমাদের আমার কথা মানতে হবে, নিজেদের কর্মকাণ্ডকে কুরআনের শিক্ষানুযায়ী সাজাতে হবে। রমযান মাসে যখন পুণ্য কাজের একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, দরস-তিলাওয়াত প্রভৃতির ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তখন আমার পথনির্দেশনা ও আদেশ-নিষেধ দেখ! গভীরভাবে অভিনিবেশ কর! শ্রবণ কর এবং এর ওপর আমল কর। নিজেদের ঈমানকে যাচাই করে দেখ যে, তোমাদের ঈমান কতটা দৃঢ়। কোন বিপদে পড়লে, পরীক্ষায় ঈমান দোদুল্যমান হচ্ছে না তো? যাহোক, এটি এমন এক বিষয় যাতে প্রথমে বান্দাকে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং যখন এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও স্নেহ উদ্বেলিত হয়,

তাঁর দয়া উদ্বেলিত হয়। অতএব এ বিষয়টি অনুধাবন করা আমাদের জন্য অতি আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, "দোয়া ইসলামের বিশেষ গর্ব এবং মুসলমানরা এটি নিয়ে খুবই গর্বিত। কিন্তু স্মরণ রাখ! দোয়া মৌখিক বুলি আওড়ানোর নাম নয়, বরং এটি সেই বস্তু যার ফলে হৃদয় খোদা ভীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়াকারীর আত্মা পানির মত প্রবাহিত হয়ে খোদার দরবারে গিয়ে পৌঁছে এবং নিজ দুর্বলতা ও দোষত্রুটির জন্য সর্বশক্তিশালী ও মহাপরাক্রমশালী খোদার সমীপে শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করে এটি সেই অবস্থা যাকে অন্য ভাষায় মৃত্যু বলা যেতে পারে। যখন এই অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন নিশ্চিত হতে পারো যে, এমন ব্যক্তির জন্য দোয়া গৃহীত হবার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। পাপ থেকে বাঁচার এবং স্থায়ীভাবে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য বিশেষ শক্তি, কৃপা এবং অবিচলতা প্রদান করা হয় এবং এটি সবচেয়ে মহান মাধ্যম।" *(মালফুযাত, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৩, ১৯৮৪ এডিশন)*

কাজেই এটি হচ্ছে দোয়ার রীতি এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়, দোয়া গ্রহণ করানোর মাধ্যম এবং পাপমুক্ত হওয়ার পদ্ধতি। ইদানিং একটি প্রশ্ন প্রায়শ করা হয় যে, আমরা কীভাবে বুঝব যে, আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এখানে একটি নীতিগত কথা বলে দিয়েছেন, যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যা একটি স্থায়ী সম্পর্ক, যেটি লাভের জন্য মানুষ প্রকৃত অর্থে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি এমন কৃপা করেন যা তাকে মন্দ থেকে আত্মরক্ষার স্থায়ীশক্তি দান করেন। শুধু মন্দ থেকে আত্মরক্ষাই করে না বরং সৎকর্ম করার ও চিরস্থায়ী পুণ্যকাজ করার শক্তি সামর্থ্য দান করা হয়। যদি এটি না হয় তাহলে মানুষ এ কথা বলতে পারে না যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করেছি। কাজেই মানুষ প্রকৃত বান্দা তখনই হবে যখন এভাবে চিন্তা করবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করবে। এটি লাভের জন্য আমাদের এই রমযান মাসে অনেক বেশি চেষ্টা করা উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, দোয়ার প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে দোয়ারই একটি শাখা। এটি জানা কথা, যে ব্যক্তি মূলকে চেনে না বা বুঝে না তার জন্য শাখা চিনতে বা বুঝতে সমস্যা হয়, বুঝতে ভুল করে। কোন বিষয়কে বুঝার জন্য সেটির মূলকে বুঝতে হয়। যদি মৌলিক বিষয়ই বোধগম্য না হয় তাহলে সেটির তাত্ত্বিক দিক ও ব্যাখা যতই দেয়া হোক না কেন তা বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। তিনি (আ.) বলেন, দোয়ার রহস্য হল, এক পুণ্যবান বান্দা এবং তাঁর প্রভুর মাঝে আকর্ষণের সম্পর্ক থাকে অথবা আকৃষ্ট করার সম্পর্ক থাকে। রহমানিয়্যত বান্দাকে প্রথমে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে তারপর বান্দার আন্তরিকতাপূর্ণ চেষ্টার ফলে খোদা তাঁর নিকটবর্তী হন। যদি বান্দা নিষ্ঠা ও সততার সাথে চেষ্টা করে তাহলে খোদা তা'লাও বান্দার নিকটবর্তী হয়ে যান। দোয়ার অবস্থায় এ সম্পর্ক একটি বিশেষ মানে উপনীত হয়ে স্বীয় বিস্ময়কর বিশেষত্ব প্রকাশ করে। অদ্ভুত ও অভাবনীয় বিশেষত্ব প্রকাশিত হয়। যখন বান্দা কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে খোদাতা'লার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা এবং আশা ও পূর্ণ ভালবাসা, পূর্ণ নিষ্ঠা ও সংকল্প নিয়ে তাঁর প্রতি বিনত হয়। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যারপর নাই নিরাশক্তি দেখিয়ে আলস্যের পর্দা ছিন্ন করে আত্মবিলীনতার ময়দানে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যেতে থাকে তখন সামনে সে আল্লাহ্ তা'লার দরবার দেখতে পায়। আর সেখানে তার সাথে কোন শরীক নেই তখন তার আত্মা খোদা তা'লার দরবারে সেজদাবনত হয়। তখন সে কেবল আল্লাহ্‌কেই দেখতে পায়, জাগতিক সকল বস্তু তার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। পৃথিবীর কোন গুরুত্ব থাকে না তার কাছে, কোন বস্তু কোন প্রকার গুরুত্ব রাখে না কেবল আল্লাহ্ তা'লাই তার সামনে দৃশ্যমান থাকেন। যখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং খোদাকে দর্শন করে তখন তাঁর সামনেই তার আত্মা অবনত হয়। আকর্ষণ শক্তি যা তার মাঝে নিহিত রাখা হয়েছে তখন সেটিই খোদা তা'লার পুরস্কাররাজিকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। বান্দার মাঝেও খোদাকে আকর্ষণ করার যে শক্তি রাখা হয়েছে, তা আল্লাহ্ তা'লার দান বা পুরস্কারকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে দেয়। তখন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তার কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য সেদিকে মনযোগ দেন এবং তার দোয়ার প্রভাব বাহ্যিক উপকরণের ওপর সৃষ্টি করেন। সেই মৌলিক উপকরণ যা সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য আবশ্যক, যেসব উপকরণ প্রয়োজন হয় সেগুলোর ওপর খোদা তা'লা নিজ প্রভাব বিস্তার করেন। এগুলোর মাধ্যমে এমনসব উপকরণ সৃষ্টি হয় যেগুলো উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জনের জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে। যেমন, বৃষ্টির জন্য দোয়া করা হলে দোয়া গৃহীত হবার পর প্রাকৃতিক সেসব উপকরণ যা বৃষ্টির জন্য আবশ্যক তা এই দোয়ার প্রভাবে সৃষ্টি করা হয়। আবার যদি দুর্ভিক্ষের জন্য দোয়া করা হয় তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এর বিপরীত উপকরণ সৃষ্টি করে দেন।

এরপর বলেন, নবী-রসূলের মাধ্যমে যেসব হাজার হাজার অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে বা পুণ্যাত্মা আউলিয়ারা আজ পর্যন্ত যেসব অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করে এসেছেন তার মূল বা উৎস এই দোয়াই। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দোয়ার প্রভাবেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র বিভিন্ন ধরণের অলৌকিক লিলা প্রদর্শন করা হচ্ছে। *(বারাকাতুদ দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ০৯-১০)*

পবিত্র কুরআনও অগণিত ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ। এছাড়াও আমরা দেখি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, অনেক বিষয় পূর্ণ হয়েছে, অনেক পুণ্যবান লোকেরা ভাল ভাল স্বপ্ন দেখেন- তা পূর্ণ হয় আর এভাবে দোয়ার প্রভাব প্রকাশিত হয়। মোটকথা, এসব বিষয় তখনই বাস্তবায়িত হয় যখন একনিষ্ঠ হয়ে বান্দা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে অবনত হয়। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ আমাদের পথে যারা চেষ্টা-সাধনা করবে আমরা তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করব। চেষ্টা-সাধনার সূচনা করা বান্দার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তোমাদেরকে চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। এটি হল, প্রতিশ্রুতি আর পক্ষান্তরে এই দোয়া রয়েছে যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ আল্লাহ্ তা'লা একদিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, চেষ্টা-সাধনা কর তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করব। অপরদিকে এই দোয়াও শিখিয়েছেন যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ অর্থাৎ আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সোজাসরল পথে পরিচালিত কর। অতএব, মানুষের উচিত এ বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রেখে নামাযে কাকুতি মিনতি ও আহাজারি করে দোয়া করা এবং এই আশা রাখা যে, সেও যেন সেসব লোকের ন্যায় হয়ে যায় যারা উন্নতি ও অন্তঃদৃষ্টি লাভ করেছে। এই দুনিয়া থেকে অন্তঃদৃষ্টিশূন্য হয়ে এবং অন্ধ অবস্থায় যেন উত্থিত হতে না হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى

অর্থাৎ যে এ দুনিয়াতে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধই থাকবে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ হবে। যে এখানে বৈষয়িকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত, যে আল্লাহ্ তা'লাকে চিনতে পারে নি, যে দোয়ার রহস্য বুঝে নি, যে দোয়ার প্রভাবকে উপলব্ধি করে নি এবং পার্থিবতাতেই মত্ত ছিল এমন ব্যক্তি পরকালেও আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য পেতে পারে না। অতএব তিনি বলেন, পরকালের প্রস্তুতি এই দুনিয়া থেকেই আরম্ভ হওয়া উচিত, তাই এজন্য প্রস্তুতি নাও। তিনি (আ.) বলেন, উদ্দেশ্য হল, পরকালে দেখতে হলে ইহজগত থেকেই আমাদেরকে চোখ নিয়ে যেতে হবে। পরজগতে যদি দেখতে হয় আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভকারী জগতকে যদি দেখতে হয় তাহলে আমাদেরকে এই জগত থেকেই দেখার জন্য চোখ নিয়ে যেতে হবে। পরজগতকে উপলব্ধি করার জন্য ইন্দ্রীয়সমূহের প্রস্তুতি ইহকালেই সম্পন্ন করতে হবে। সুতরাং, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবেন না তা কল্পনা করা যায় কি! তিনি বলেন, অন্ধ বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক স্বাদ পাওয়া হতে বঞ্চিত। এক ব্যক্তি মুসলমানের ঘরে জন্ম হয়েছে বলে অন্ধ অনুকরণ করছে, নিছক অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করে কোন আমল নাই অর্থাৎ সে নামে মাত্র মুসলমান আখ্যায়িত হয়। অপরদিকে একইভাবে কোন খ্রিস্টান খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম নিয়েই খ্রিস্টান হয়ে যায়। এমন লোকেরা যে খোদা, রসূল এবং পবিত্র কুরআনের কোন সম্মান করে না– এর এটাই কারণ। ধর্মের প্রতি তার ভালবাসাও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। যে অন্ধ অনুকরণ করছে– ধর্মের প্রতি তার ভালবাসাও আপত্তিযোগ্য। খোদা ও রসূলের অবমাননাকারীদের মাঝে তার ওঠাবসা। এর একমাত্র কারণ হল, এমন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক চোখ নেই, তার মাঝে ধর্মের প্রতি ভালবাসা নেই; নতুবা এক ব্যক্তি, যার মাঝে প্রেমাস্পদের জন্য ভালবাসা আছে, সে প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি পরিপন্থী কোন কিছু করা পছন্দ করবে কি? যদি ভালবাসা থাকে, তবে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের বিরুদ্ধে কোন কিছুই পছন্দ করে না। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'লা শিখিয়েছেন যে, তুমি যদি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাক, তবে আমি তো হিদায়াত দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি! সুতরাং দোয়া করা উচিত, কারণ দোয়া করাটাই সেই হিদায়াত বা সঠিক পথ গ্রহণের প্রস্তুতি। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০, ১৯৮৪ এডিশন)*

অতএব, এই দিনগুলোতে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ দোয়া অনেক বেশি করুন; আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন, হৃদয়সহূকেও পবিত্র করে প্রকৃত বান্দায় পরিণত করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার বান্দার অধিকার প্রদানকারী বানান। উগ্রপন্থীরা আজকাল যেমনটি করছে– তাদের মতো যেন আমরা না হয়ে যাই। আল্লাহ্ ও রসূলের নামে অত্যাচার করা হচ্ছে! আল্লাহ্ তা'লা এমন অত্যাচারীদের দুস্কৃতি থেকে সবাইকে রক্ষা করুন। কিছু মানুষ বলে বসে যে, আমরা তো এতটাই পাপী হয়ে গেছি যে, খোদা তা'লা এখন আর আমাদের ক্ষমা করবেন না! এই প্রশ্নও কেউ কেউ করে বসে যে, মানুষ কতটা পাপী হলে ক্ষমা পেতে পারে? এছাড়া, আমাদেরকে আর ক্ষমা করা হবে না– এই ধারণায় তারা আরও বেশি পাপে লিপ্ত হতে থাকে। আসলে, শয়তান তাদের মনে এক কুপ্ররোচনা সৃষ্টি করতে থাকে, খোদা-বিমুখ করার জন্য শয়তান নিজের কারসাজি চালিয়ে যেতে থাকে; আর এমন মানুষ তখন শয়তানের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে শয়তানের এই আক্রমণ ও খপ্পর থেকে মুক্তির পদ্ধতি শেখাতে গিয়ে বলেন,

পাপী ব্যক্তি নিজের পাপাধিক্য ইত্যাদির কথা ভেবে কখনওই যেন দোয়া থেকে বিরত না হয়! কখনও (একথা ভেবে) থেমে যেও না যে, পাপ অনেক বেশি হয়ে গেছে। দোয়া হল, প্রতিষেধক। দোয়ার ফলে অবশেষে সে দেখতে পাবে যে, পাপ তার কাছে কতটা খারাপ লাগা আরম্ভ হয়েছে! দোয়া-ই তো পাপ থেকে মুক্তির চিকিৎসা। অবিচলতার

সাথে দোয়া করলে পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হতে দেখবে। শয়তান দৌড়ে পালাবে! যারা অবাধ্যতায় নিমগ্ন হয়ে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায় এবং তওবার প্রতি মনোযোগ দেয় না, তারা অবশেষে নবী-রসূল ও তাদের (পবিত্রকরণ) প্রভাবও অস্বীকার করে বসে। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪-৫, এডিশন ১৯৮৪)*

এরপর তারা ধর্ম থেকেও ছিটকে পড়ে; এমন মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়। আর নবী-রসূলদের থেকে দূরে যেতে যেতে অবশেষে নাস্তিক হয়ে যায়। অতএব, ইসলাম এমন মানুষদেরও আশার কিরণ দেখায় যারা পাপে নিমজ্জিত। আর কীভাবে পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এই সুযোগ সৃষ্টির জন্যই, সেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবছর এই রমযান মাস আমাদের উপহার দেন। তাই এই মাস থেকে উপকৃত হওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের একটি ইলহাম 'উজীবু কুল্লা দু'আইকা'– এর উল্লেখ করে বলেন,

আমার সাথে আমার মহাসম্মানিত প্রভুর স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, 'উজিবু কুল্লা দু'আইকা' (অর্থাৎ, আমি তোমার প্রতিটি দোয়া কবুল করব)। কিন্তু আমি খুব ভালভাবে জানি যে, 'কুল্ল (অর্থাৎ সব) দোয়া বলতে সেসব দোয়া বুঝায় যা গৃহীত না হলে ক্ষতি হয়। 'প্রতিটি দোয়া'-র অর্থ এটি নয় যে, প্রত্যেক দোয়াই গৃহীত হবে; 'প্রতিটি' কথার অর্থ হল– যেসব দোয়া গৃহীত হলে ক্ষতি হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যদি তরবীয়ত ও সংশোধন করতে চান, তাহলে প্রত্যাখ্যান করাই (মূলত) দোয়া গৃহীত হওয়া। কখনও কখনও মানুষ কোন দোয়া করে ব্যর্থ হয় এবং ভাবে, খোদা তা'লা দোয়া প্রত্যাখ্যান করেছেন! অথচ খোদা তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেন! সেই প্রত্যাখ্যানই (আসলে) দোয়া কবুল হওয়া; কেননা পর্দার অন্তরালে এবং প্রকৃতপক্ষে সেই দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মাঝেই তার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত থাকে। মানুষ যেহেতু অদূরদর্শী বরং বাহ্যিকতার পূজারী হয়ে থাকে– তাই তার উচিত, যখন সে আল্লাহ্‌তা'লার কাছে কোন দোয়া করে এবং তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ফলাফল প্রকাশ না পায়– তখন সে যেন খোদার প্রতি এই কুধারণা না করে যে, তিনি আমার দোয়া শোনেন নি! তিনি সবার দোয়া শোনেন! তিনি ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ বলেছেন। রহস্য ও ভেদ এটাই যে, দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মাঝেই দোয়াকারীর কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত থাকে। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৬)*

অতঃপর এ বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

দোয়ার মূলনীতি হল, দোয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ধারণা এবং কামনা বাসনার অধীনস্থ নন। দেখ! সন্তান মায়ের কাছে কতই না প্রিয় হয়ে থাকে? তিনি চান তাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। কিন্তু সন্তান যদি অনর্থক জেদ করে আর কেঁদে কেঁদে ধারালো ছুরি বা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিতে চায় তাহলে মা সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আন্তরিকতার কারণে কখনও কি চাইবে যে, তার সন্তান জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলুক বা ছুরির তীক্ষ্ণ ধারালো প্রান্তে হাত দিয়ে হাত কেটে ফেলুক, কখনও নয়। একই নীতির আলোকে দোয়া গৃহীত হওয়ার নীতিটিও বুঝা সম্ভব। তিনি (আ.) বলেন, এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। দোয়ায় ক্ষতিকর কোন দিক থাকলে সেই দোয়া আদৌ গৃহীত হয় না। আমার সমস্ত দোয়াই গৃহীত হয়েছে- এমন নয়। আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, তিনি অদৃশ্যের সংবাদ রাখেন। যখনই কোন দোয়ায় কোন ক্ষতিকর দিক অন্তর্নিহিত থাকে তখন আমার সেই দোয়া গৃহীত হয়না। তিনি (আ.) বলেন,এ কথা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, আমাদের জ্ঞান (সর্বক্ষেত্রে) সুনিশ্চিত এবং সঠিক হয় না, অনেক কাজ আমরা খুবই আনন্দের সাথে কল্যাণময় মনে করে করি আর ধরে নেই, এর ফলাফল কল্যাণময় বা আশিসময় হবে, কিন্তু পরিণামে তা এক দুঃখ এবং সমস্যা হিসেবে আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যায়।

এর বহু উদাহরণ আমরা বর্তমানেও দেখে থাকি। প্রতিদিনের ডাকে মানুষের চিঠি আসে আর (সেখানে) তারা উল্লেখ করে যে, তারা দোয়া করছে আর জোরপূর্বক কোন কাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পরিণাম ভাল প্রকাশ পায় না তখন আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা অনেক দোয়া করেছিলাম আর অনেক সদকা-খয়রাত করে এই কাজ শুরু করেছিলাম, তথাপি ফল ভাল হয়নি অথবা আমাদের দোয়া গৃহীত হয়নি। প্রথম কথা হল, এটি দেখতে হবে যে, দোয়া, যা পরম মার্গে পৌঁছানো আবশ্যক, তা পৌঁছানো হয়েছে কিনা। খোদার সাথে যে সম্পর্ক স্থাপিত হবার কথা, তা হয়েছে কিনা? যদি এমনটি না হয় তাহলে তা কেবল বুলি আওড়ানো, যেমনটি কিনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন। আর যদি দোয়াকে পরম মার্গে পৌঁছানো হয়ে থাকে আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা সেই কাজকে প্রত্যাখ্যান করেন অথবা এর কোন (উত্তম) ফলাফল প্রকাশিত না হয়, তাহলে (ধরে নিতে হবে) এতেই খোদার সুপ্ত প্রজ্ঞা নিহিত, এর মাঝেই মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত। যদি মানুষ নিজের ভুলের কারণে জোরাজুরি করে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে অভিযোগকরার পরিবর্তে ইস্তেগফার করা উচিত যে, আমি ভুল করেছি আর যে বিষয়টি আমার স্বার্থানুকূল ছিল না, তা লাভের জন্য আমি জোরাজুরি করেছি। কতক এমনও রয়েছেন যারা দোয়া করে বলেন, আল্লাহ্ গ্রহণ কর, যদি কল্যাণকর না-ও হয় তবুও কবুল কর। কতক বিয়েশাদির ক্ষেত্রেও

এরূপ ঘটেছে। আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেছেন আর তার পছন্দসই জায়গায় বিয়েও হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পর বিচ্ছেদও হয়ে গেছে। এরূপ দোয়া করা উচিত নয়। অনেক সময় আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তার কিছু দোয়া কবুল করে থাকেন, যা তার জন্য কল্যাণকর হয় না। কিন্তু যখন পরিণাম প্রকাশিত হয় তখন সে তওবা ও ইস্তেগফার করে। যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, মোটকথা মানুষের সকল কামনা-বাসনা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, তা সবই যথাযথ এবং সঠিক, কেননা ভুল করা মানুষের বৈশিষ্ট্য। ভুল-ভ্রান্তি মানুষের হয়েই থাকে। তাই (এমনটি) হওয়া উচিত এবং হয় অর্থাৎ কিছু কামনা-বাসনা বা চাওয়া-পাওয়া ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা যদি তা সেভাবেই গ্রহণ করে নেন তাহলে তা খোদার রহমতের মর্যাদার সুস্পষ্ট পরিপন্থী। কিছু কামনা-বাসনা ক্ষতিকর হয়ে থাকে। কেউ যদি খোদার প্রিয় বান্দা হয় সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তার সেই দোয়াগ্রহণ করেন না, কেননা এ বিষয়টি তাঁর রহমতের যে মর্যাদা রয়েছে, তার স্পষ্ট পরিপন্থী। কিছু আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিকরও হয়ে থাকে। যদি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হয় তাহলে আল্লাহ্ সেই দোয়া তার জন্য কবুল করেন না। কেননা, এটি তাঁর রহমতের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের এভাবে কখনও ক্ষতি হতে দেন না। তিনি (আ.) বলেন, এটি এক সত্য এবং সুনিশ্চিত বিষয়,আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার দোয়া শোনেন এবং সেগুলোকে কবুলিয়্যতের মর্যাদা দান করেন। কিন্তু গণহারে সব দোয়া গ্রহণ করেন না বা প্রত্যেকের দোয়া গ্রহণ করেন না; কেননা আবেগের আতিশয্যে মানুষ অনেক সময় চূড়ান্ত পরিণতি ও পরিণামের ওপর দৃষ্টি রাখে না আর দোয়া করতে থাকে। এর চূড়ান্ত পরিণাম কী দাঁড়াবে, সে ব্যাপারে তার কোন চিন্তা-ই থাকে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা, যিনি প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরিণামদর্শী, তিনি এসব ক্ষতি ও মন্দ পরিণামকে দৃষ্টিপটে রেখে, যা এই দোয়া গৃহীত হওয়ার ফলে দোয়াকারী ভোগ করতে পারে, তা (অর্থাৎ সেই দোয়া) প্রত্যাখ্যান করে দেন। আর এই দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়া-ই (তার জন্য) দোয়া গৃহীত হওয়ার নামান্তর। তাঁর প্রিয় বান্দাদের ক্ষেত্রে এটিই খোদা তা'লার রীতি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এমন দোয়া কবুল করে থাকেন যার ফলে মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু ক্ষতিকর দোয়াসমূহকে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যাখ্যান করার আদলে গ্রহণ করে নেন। তিনি (আ.) বলেন, আমার ওপর অনেকবার এই ইলহাম হয়েছে, (যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে) 'উজীবু কুল্লা দু'আইকা' অর্থাৎ আমি তোমার প্রতিটি দোয়া কবুল করব। অন্যভাষায় এভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক এমন দোয়া, যা উদ্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে কল্যাণকর ও উপকারী তা গৃহীত হবে। (অর্থাৎ) তিনি (আ.) এর এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, যে দোয়া কল্যাণকর, তা কবুল করা হবে। তিনি (আ.) বলেন, এ বিষয়টি আমার হৃদয়পটে জাগ্রত হতেই আমার আত্মা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। প্রথম দিকে, ২৫-৩০ বছর পূর্বে যখন আমার প্রতি প্রথম এই ইলহাম হয়, তখন আমি পরম আনন্দিত হই যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া, যা আমার বা আমার বন্ধুদের জন্য (করা) হবে, তা অবশ্যই কবুল করবেন। অতঃপর আমি চিন্তা করি যে, এক্ষেত্রে কৃপণতা প্রদর্শন করা উচিত নয়, কেননা এটি একটি ঐশী অনুগ্রহ বা পুরস্কার এবং আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের সম্পর্কে বলেছেন, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (অর্থাৎ, আর আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে তারা খরচ করে)। অতএব, আমি আমার বন্ধুদের জন্য এই নীতি অবলম্বন করে রেখেছি যে, তারা আমাকে স্মরণ করাক বা না করাক, কোন গুরুতর বিষয় উপস্থাপন করুক বা না করুক, কঠিন বিষয় উপস্থাপন করুক বা না করুক- তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণের জন্য দোয়া করা হয়। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৬-১০৮, এডিশন ১৯৮৪)*

দোয়া কবুলিয়্যতের শর্ত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এই বিষয়টিও গভীর মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত যে, দোয়া কবুলিয়্যতের জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে কতক দোয়াকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কতক যারা দোয়া করায় তাদের সাথে। যারা দোয়া করায় তাদের জন্য আবশ্যক হল, তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতিকে দৃষ্টিপটে রাখে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে দোয়া করার জন্য বলে, তার জন্যও আবশ্যক হল, সে যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতিকে দৃষ্টিপটে রাখে এবং তাঁর ব্যক্তিগত অমুখাপেক্ষীতাকে যে সর্বদা ভয় করে। একথা যেন স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ তা'লা অমুখাপেক্ষী। সর্বদা তার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় থাকা উচিত। আর শান্তিপ্রিয়তা ও খোদা তা'লার ইবাদতকে নিজের রীতিনীতি বানিয়ে নেয়। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, শান্তিপ্রিয়তা ও খোদা তা'লার ইবাদতকে যেন নিজের অভ্যাসে পরিণত করে। তাকওয়া ও সততার মাধ্যমে যেন খোদাকে সন্তুষ্ট করে- এরূপ অবস্থায় দোয়ার জন্য কবুলিয়্যতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যখন এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হবে আর এসব শর্ত পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহ্ তা'লার দোয়া কবুলিয়্যতের দ্বার খুলে দেয়া হয়। আর সে যদি খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে, তাঁর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে ও যুদ্ধে লিপ্ত হয় (অর্থাৎ) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশানুযায়ী যদি না চলে, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও বান্দার অধিকার প্রদান না করে, সে ক্ষেত্রে তার দুষ্কৃতি ও মন্দকর্ম দোয়া (কবুলিয়্যতের) পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক বা প্রাচীর ও পাথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যায়; অর্থাৎ প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে,

প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, বড় পাথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যাবে; এবং দোয়া কবুলিয়্যতের দ্বার তার জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। তার জন্য দোয়া কবুলিয়্যতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়; তার নিজের দোয়াও গৃহীত হয় না আর যার মাধ্যমে সে দোয়া করায় তার দোয়াও তার পক্ষে গৃহীত হয় না। তিনি (আ.) বলেন, অতএব, আমাদের বন্ধুদের জন্য আবশ্যক হল, তারা যেন আমাদের দোয়াসমূহকে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং এ পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, যা তাদের বৃথা কর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৮, এডিশন ১৯৮৪)*

যদি এই কর্ম সঠিক না হয় তাহলে আমার দোয়াও তোমাদের পক্ষে গৃহীত হবে না। বরং তোমাদের কর্ম দোয়া গৃহীত হবার পথে বাদ সাধবে।

এরপর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য এটিও আবশ্যক যে, মানুষ যেন বিশ্বাসের দিক থেকে দৃঢ় হয়। এটি মৌলিক শর্ত। এছাড়া তারা যেন সৎকর্মশীল হয়। সৎকর্মের বিষয়টি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার ডাকে সাড়া দাও এবং আমার নির্দেশ মান্য কর। আল্লাহ্ তা'লার কথা বা নির্দেশাবলীর ইতিবাচক উত্তর দেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা– এটি একটি মৌলিক বিষয় এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

এটি সত্য কথা, যে ব্যক্তি কর্মের সাহায্য নেয় না, সে দোয়া করে না, বরং আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করে। তাই দোয়া করার পূর্বে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক আর এ দোয়ার এটিই অর্থ। প্রথমে নিজের বিশ্বাস এবং কর্মের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা মানুষের জন্য আবশ্যক, কেননা উপকরণের ভিত্তিতে অবস্থার সংশোধন করাই হল আল্লাহ্‌র রীতি, (যখন সংশোধনের জন্য আবশ্যক উপকরণ সহজলভ্য হবে আর নিজের অবস্থা শুধরানোর চেষ্টা করবে তখন সংশোধনও হবে)। তিনি এমন কোন উপকরণ সৃষ্টি করবেন যা সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে। (যদি আন্তরিকতার সাথে দোয়া করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও এমন উপকরণ সৃষ্টি করে দেন যা সংশোধনের কারণ হয়ে যায়।) যারা বলে, দোয়া করলে আর উপকরণের প্রয়োজন কী?– তাদের এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। এসব নির্বোধের চিন্তা করা উচিত যে, দোয়া তো নিজেই একটি গুপ্ত উপকরণ। দোয়া করাকে-ও খোদা তা'লা একটি কারণ বলেছেন যা অন্য উপকরণ সৃষ্টি করে এবং কোন কাজ সমাধার কারণ হয়। তিনি (আ.) বলেন, আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ -কে যে إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর পূর্বে রাখা হয়েছে– দোয়া সূচক বাক্যটি এ বিষয়টিকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করছে। অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি আর এরপর তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, যেন আমাদের কার্য সমাধা হয়ে যায়। মোটকথা আল্লাহ্‌র এমন রীতিই আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, তিনি উপকরণ সৃষ্টি করেন। (মানুষের জন্য উপকরণ সৃষ্টি করে দেন)। দেখ! তৃষ্ণা মেটাতে পানি, ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেন, কিন্তু তা কোন উপকরণের মাধ্যমে করেন। এমনটি নয় যে, এমনিতেই তৃষ্ণা মিটে যাবে অথবা হঠাৎ যাদুর মতো পানি এসে যাবে। আগে কোন উপকরণ বা মাধ্যম সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে খাদ্য ও পানীয় লাভ হয়। অতএব উপকরণের রীতি এভাবেই কাজ করছে আর অবশ্যই উপকরণ সৃষ্টি হয়। কেননা এ দু'টিই খোদা তা'লার নাম অর্থাৎ كَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (সূরা আল্-ফাতাহ্: ০৮) 'আযীয' শব্দের অর্থ হল, সকল কর্ম সম্পাদন করে দেয়া আর 'হাকীম' অর্থ হল, প্রতিটি কাজ কোন প্রজ্ঞার অধীনে স্থানকালপাত্রভেদে এবং ভারসাম্যপূর্ণ করে দেয়া। দেখ! উদ্ভিদ এবং জড় বস্তুতে তিনি বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। জামাল গোটাকেই দেখ! তা দু'এক তোলা খেলেই দাস্ত হয়। অনুরূপভাবে 'Scammonya'-তে একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন উপকরণ ছাড়াই পাতলা পায়খানা হবে বা পানি ছাড়াই তৃষ্ণা মিটে যাবে– এমনটি করার শক্তি আল্লাহ্ তা'লা রাখেন। কিন্তু প্রকৃতির বিস্ময়াদি সম্পর্কে অবহিত করাও যেহেতু আবশ্যক ছিল, (আল্লাহ্ তা'লা যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন সেগুলো হল প্রকৃতির নানাবিধ বিস্ময়, এগুলো সম্পর্কে অবগত করানোও আবশ্যক ছিল।) কেননা প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃত হয় ততই মানুষ খোদার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর নৈকট্য লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা থেকে শতসহস্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায়। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৪-২৫, এডিশন ১৯৮৪)*

মানুষ যদি আত্মিক চক্ষু দিয়ে দেখে তাহলে যেসব জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে সেই প্রত্যেক সৃষ্টি বা প্রতিটি বস্তু দেখে একজন একত্ববাদী বিজ্ঞানী সেটিতে গভীর মনোনিবেশ করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সম্পর্কে প্রমাণ লাভ করে আর তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একজন নাস্তিক একে কাকতালীয় ঘটনা আখ্যা দেয়। যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃতির বিস্ময়াদি দেখানোর কারণই হল মানুষ যেন বুঝতে পারে যে, প্রতিটি জিনিসেরই একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন,

তাদের তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা উচিত। কেননা তাকওয়াই এমন একটি বিষয় যাকে শরীয়তের মূল বলা যায়। শরীয়তকে যদি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হয় তাহলে শরীয়তের মগজ বা প্রাণ তাকওয়াই হতে পারে। তাকওয়ার অনেক স্তর ও ধাপ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত সত্যান্বেষী হয়ে যদি প্রাথমিক স্তরগুলো অবিচলতা এবং নিষ্ঠার সাথে অতিক্রম

করে তাহলেই সে উক্ত সততা ও সত্য সন্ধানের কারণে মহান পদমর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (সূরা আল্ মায়েদা: ২৮)এক কথায় খোদা তা'লা মুত্তাকীদের দোয়া গ্রহণ করেন। إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (সূরা আল্ মায়েদা: ২৮) যেন তাঁর প্রতিশ্রুতি, আর প্রতিশ্রুতির কোন ব্যত্যয় ঘটে না। যেমনটি তিনি বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (সূরা আর রা'দ : ৩২) আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (সূরা আর রা'দ : ৩২)

অতএব যে অবস্থায় দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য তাকওয়ার শর্ত একটি অবিচ্ছেদ্য এবং মৌলিক শর্ত, (এমন শর্ত যাকে পৃথক করা যায় না, ছেড়ে দেয়া যায় না বা রদ করা যায় না) তখন এক ব্যক্তি যদি উদাসীন ও ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে দোয়া গৃহীত হওয়ার প্রত্যাশী হয় তাহলে কি সে নির্বোধ ও আহাম্মক নয়? তাই তাকওয়ার পথে যথাসাধ্য পদচারণা করা আমাদের জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের জন্য আবশ্যক, যেন তারা দোয়া গৃহীত হওয়ার স্বাদ ও আনন্দ পেতে পারে আর ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার প্রতি ঈমান আনয়ন কর আর এভাবেই ঈমান বৃদ্ধি পাবে। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৮-১০৯, এডিশন ১৯৮৪)*

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'রহম' বা দয়ার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, স্মরণ রাখতে হবে, 'রহম' বা দয়া দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি রহমানিয়্যত আর অন্যটি রহিমিয়্যত নামে আখ্যায়িত। রহমানিয়্যত এমন কল্যাণধারা যার সূচনা আমাদের সত্তা ও অস্তিত্ব সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা সূচনাতেই তাঁর আদি জ্ঞানের মাধ্যমে অবলোকন করে এমন স্বর্গমত্য পার্থিব ও ঐশী উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যার সবই আমাদের প্রয়োজন এবং আমাদের কাজে লাগে। এসব উপকরণ থেকে সাধারণত মানুষই উপকৃত হয়। ছাগল, ভেড়া ও অন্যান্য জীবজন্তু– এসবই যেখানে মানুষের জন্য উপকারী প্রাণী, তারা কী (কখনও) লাভবান হয়? এসব কিছু মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা কীভাবে লাভবান হবে? দেখ! দৈহিক বিষয়ে মানুষ কতই না সুস্বাদু ও উন্নত মানের খাদ্য ভক্ষণ করে। মানুষের জন্য উন্নত মানের মাংস কিন্তু উচ্ছিষ্ট এবং হাড়গোড় হল কুকুরের জন্য। দৈহিকভাবে মানুষ যে স্বাদ ও মজা পায় তাতে যদিও জীবজন্তু অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মানুষ তা হতে বেশি লাভবান হয়, আর আধ্যাত্মিক স্বাদের ক্ষেত্রে তো জীবজন্তুরা অংশীদারই নয়। আধ্যাত্মিক স্বাদ কেবলমাত্র মানুষের জন্যই, জীবজন্তু তো এতে অন্তর্ভুক্তই নয়। অতএব এই হল দু'ধরনের কৃপা। একটি হল সেটি যা আমাদের অস্তিত্বের সূচনার পূর্বেই সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন মৌলিক বস্তু বা এলিমেন্ট এবং এ ধরনের অন্যান্য উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে, যা আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। এগুলো আমাদের সত্তা, আকাঙ্ক্ষা ও দোয়ারও পূর্বের জিনিস। আমাদের সৃষ্টিরও পূর্বের বস্তু এগুলো, আমাদের আকাঙ্ক্ষা করার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান এবং আমাদের দোয়া করার পূর্ব থেকেই বিরাজমান রয়েছে, যা রহমানিয়্যত–এর দাবির কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে। এসব জিনিস আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে। আরেকটি রহমত বা কৃপা হল রহিমিয়্যত। অর্থাৎ আমরা যখন দোয়া করি তখন আল্লাহ্ তা'লা দান করেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে, প্রকৃতির বিধানের সাথে সর্বদাই দোয়ার একটি সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে কতক লোক এটিকে বেদা'ত মনে করে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের দোয়ার যে সম্পর্ক রয়েছে সেটিও আমি বর্ণনা করতে চাই। (অর্থাৎ একজন মানুষের সাথে দোয়ার যে সম্পর্ক রয়েছে– তা বর্ণনা করে) তিনি (আ.) বলেন, একটি শিশু যখন ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে দুধের জন্য চিৎকার ও আহাজারি করে তখন মায়ের স্তনে সবেগে দুধ নেমে আসে। শিশু দোয়ার নামও জানে না, কিন্তু তার চিৎকার দুধকে কীভাবে টেনে আনে? এর অভিজ্ঞতা সবারই আছে। অনেক সময় দেখা যায় মায়েরা স্তনে দুধের উপস্থিতি অনুভবও করে না, কিন্তু শিশুর চিৎকার দুধ টেনে আনে। খোদার দরবারে যখন আমাদের চিৎকার নিবেদিত হবে তখন কী তা কিছুই টেনে আনতে পারে না? আসে আর সব কিছুই আসে, কিন্তু যারা পণ্ডিত ও দার্শনিক সেজে বসে আছে, এমন দৃষ্টি প্রতিবন্ধিরা তা দেখতে পায় না। শিশুর সাথে মায়ের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক ও সম্বন্ধ মাথায় রেখে মানুষ যদি দোয়ার দর্শনের বিষয়ে প্রণিধান করে তাহলে এটি অত্যন্ত সহজ ও সরল বিষয় মনে হয়। দ্বিতীয় ধরনের 'রহম' বা দয়া এ শিক্ষা দেয় যে, একটি 'রহম বা দয়া' যাচনার পর সৃষ্টি হয়। চাইতে থাকবে পেতে থাকবে। ادْعُونِيأَسْتَجِبْلَكُمْ এটি কোন বাগাড়ম্বরতা নয়, বরং মানব প্রকৃতির একটি আবশ্যিক দিক। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৮-১৩০, এডিশন ১৯৮৪)*

এই বিষয়টির গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরও বলেন, যাচনা করা মানুষের বৈশিষ্ট্য আর আহ্বানে সাড়া দেয়া আল্লাহ্‌র কাজ। তিনি (আ.) বলেন,

যাচনা করা মানুষের বৈশিষ্ট্য আর সাড়া দেয়া খোদা তা'লার গুণ। যে এটি বুঝে না এবং স্বীকার করে না, সে মিথ্যাবাদী। শিশুর যে দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি {অর্থাৎ তিনি (আ.) পূর্বেই দিয়েছেন} তা দোয়ার দর্শনকে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে। রহমানিয়্যত ও রহিমিয়্যত দু'টি পৃথক বিষয় নয়। কাজেই যে ব্যক্তি একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির সন্ধান করে, সে তা পেতে পারে না। রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের দাবি হল, আমাদের মাঝে রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানোর

শক্তি সৃষ্টি করা। আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত হল, তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন বলে দিয়েছেন এবং উপকরণও দিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর যেসব জিনিস চেয়ে নিতে হবে সেটির জন্য উদ্দম-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন এবং এজন্য রহমানিয়্যত দোয়া করানো এবং আল্লাহ্ তা'লার রহিমিয়্যত লাভ করার জন্য উপকরণ সৃষ্টি করে। তিনি (আ.) বলেন, যে এমনটি করে না সে এই নিয়ামতকে অস্বীকার করে। إِيَّاكَ نَعْبُدُ -র অর্থ হল যেসব বাহ্যিক উপায় ও উপকরণ তুমি দান করেছ সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা তোমার ইবাদত করি। (আমরা সেই বাহ্যিক উপকরণের মাধ্যমে তোমার ইবাদত করি।) জিহ্বার উদাহরণ দিয়ে তিনি (আ.) বলছেন, দেখ! এই জিহ্বা যা ধমনি এবং স্নায়ুর সমন্বয়ে গঠিত। (এর শিরা, ধমনী, লালা বা স্নায়ু রয়েছে, এসব জিনিস জিহ্বার অংশ, এগুলো দিয়েই জিহ্বা গঠিত।) যদি এমনটি না হত তাহলে আমরা কথা বলতে পারতাম না। জিহ্বা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে মানুষ কথা বলতে পারে না। এতে যদি শিরা ও রগ না থাকত যার কারণে এটি সর্বদা আর্দ্র থাকে, নতুবা মানুষ জিহ্বা নাড়াতে পারত না। তিনি (আ.) বলেন, দোয়ার জন্য (আল্লাহ্ তা'লা) এমন জিহ্বা দিয়েছেন যা হৃদয়ের ধ্যানধারণা প্রকাশ করতে পারে। চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য জিহ্বা দান করেছেন, আমরা এটি দিয়ে কথা বলি। আমরা যদি দোয়ার জন্য জিহ্বাকে কখনও ব্যবহার না করি, তাহলে এটি আমাদের দুর্ভাগ্য হবে। অনেক ব্যাধি এমন আছে তাতে যদি জিহ্বা আক্রান্ত হয় তাহলে নিমিষেই জিহ্বা অকেজো হয়ে যায় এমনকি মানুষ বোবা (পর্যন্ত) হয়ে যায়। অতএব, এটি কত মহান রহিমিয়্যত বা দয়া যে, তিনি আমাদের জিহ্বা দিয়েছেন। জিহ্বা দেয়ার বিষয়ে এখানে আমার মতে সম্ভবত রহমানিয়্যত শব্দ হবে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা জিহ্বা দিয়ে রেখেছেন, এটিও তাঁর রহমানিয়্যত। অনুরূপভাবে আমাদেরকে এটি ব্যবহারের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। এটি যে আমরা ব্যবহার করি, তাও রহমানিয়্যত। অনুরূপভাবে কানের গঠনে যদি কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে কিছুই শোনা সম্ভব হয় না। হৃদয়ের অবস্থাও একই। এতে বিগলন ও কাকুতি-মিনতির অবস্থা এবং চিন্তাভাবনা ও প্রণিধানের শক্তি রাখা হয়েছে। রোগাক্রান্ত হলে এর প্রায় সবই অকেজো হয়ে যায়। উন্মাদদেরকে দেখ! তাদের শক্তিবৃত্তি কীভাবে অকার্যকর হয়ে যায়। খোদাপ্রদত্ত এসব নিয়ামতের মূল্যায়ন করা কি আমাদের জন্য আবশ্যক নয়? আল্লাহ্ তা'লা পরম অনুগ্রহবশত আমাদেরকে যেসব শক্তিবৃত্তি দান করেছেন সেগুলোকে যদি অকেজো ছেড়ে দেই তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা অকৃতজ্ঞ। কাজেই স্মরণ রেখো! আমরা যদি আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে না লাগিয়ে দোয়া করি তাহলে দোয়া কোনই কল্যাণ সাধন করতে পারে না। কেননা যেখানে আমরা প্রথম দানকেই কোন কাজে লাগাই নি সেখানে অন্যটিকে কীভাবে নিজেদের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী বানাতে পারব।

এসব উদাহরণ দিয়ে তিনি (আ.) সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির মূল্যায়ন কর এবং এগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার কর। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এগুলোর সঠিক ব্যবহাররীতি যাচনা কর। এমনটি হলে, এক বান্দা ইবাদতের প্রকৃত দায়িত্ব পালন করতে পারে, খোদা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে। এই কৃতজ্ঞতাই পরবর্তীতে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করে। আর রহমানিয়্যতের কল্যাণে প্রদত্ত উপকরণাদি এরপর রহিমিয়্যত থেকেও অংশ লাভ করে এবং মানুষ দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করে। অতঃপর বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

অতএব إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বলছে যে, হে রাব্বুল আলামীন! তোমার প্রথম দানকেও আমরা অকেজে হতে দিই নি ও নষ্ট করি নি। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এর মাঝে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষ যেন খোদা তা'লার কাছে সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি যাচনা করে, কেননা যদি তাঁর অনুগ্রহ ও কৃপা সাহায্য না করে তাহলে দুর্বল মানুষ এমন আঁধার ও অমানিশার জালে বন্দি যে, সে দোয়া-ই করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে তিনিই তাকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন এবং তিনিই সাহায্য করেন, নতুবা মানুষ তো অক্ষম, সে তো জগতের মোহে আচ্ছন্ন ও জগতের অন্ধকারে নিমজ্জিত, সে তো দোয়ার সুযোগই লাভ করতে পারে না। অতএব যতক্ষণ মানুষ খোদা তা'লার সেই অনুগ্রহকে, যা রহমানিয়্যত এর কল্যাণে সে লাভ করেছে, কাজে লাগিয়ে দোয়া না করবে, কোন উত্তম ফলাফল লাভ হতে পারে না। মানুষকে সর্বাবস্থায় সেই অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে হয়। তিনি (আ.) বলেন, আমি দীর্ঘদিন পূর্বে ব্রিটিশ আইনে দেখেছিলাম যে, 'তাকাভী' অর্থাৎ কৃষিঋণের জন্য প্রথমে কিছু সম্পদ দেখানো আবশ্যক হয়ে থাকে। 'তাকাভী' হল এক প্রকার কৃষিঋণ যা কৃষকরা গ্রহণ করে থাকে। এখানেও (মানুষ) ঋণ নেয়, এখানেও Mortgage ইত্যাদি মানুষ নিয়ে থাকে, তাতেও নিজের কিছু অর্থ জমা করাতে হয়, অথবা কোন জামানত দিতে হয় বা কোন সম্পত্তি দেখানো আবশ্যক হয়ে থাকে অর্থাৎ কার্যত কিছু উপস্থাপন করতে হয়। অনুরূপভাবে প্রকৃতির বিধানের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, আমরা পূর্বেই যা কিছু পেয়েছি তা কতটা কাজে লাগিয়েছি? যদি বুদ্ধি, চেতনা, চোখ ও কান থাকা অবস্থায় পদস্খলিত না হয়ে থাক, আর নির্বুদ্ধিতা ও উন্মাদনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাক, তাহলে দোয়া কর, ফলে আরও বেশি ঐশী কৃপা লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লা যে নিয়ামতরাজি প্রদান করেছেন তাতে যদি পদস্খলিত না হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্

তা'লার কাছে এসব নিয়ামতকে স্মরণ করে দোয়া কর, তাহলে ঐশী অনুগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে। নতুবা এটি কেবল বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৮-১৩১, এডিশন ১৯৮৪)*

যদি নিয়ামতরাজির সঠিক ব্যবহার না থাক তাহলে দোয়া কোন উপকারে আসে না, বরং বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যই মানুষের অদৃষ্ট হয়ে থাকে। অতএব, এর প্রতি আমাদের গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়ার চেষ্টা করা উচিত।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃতিতে দোয়া গৃহীত হওয়ার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আর সব যুগেই আল্লাহ্ তা'লা জীবন্ত বা নিত্যনতুন আদর্শ প্রেরণ করেন। এজন্যই তিনি اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ দোয়া শিখিয়েছেন। এটি খোদা তা'লার অভিপ্রায় ও নিয়ম, আর কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ দোয়ায় যে শিক্ষা রয়েছে তা হল, আমাদের কর্মকে তুমি পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ কর। অর্থাৎ আমাদের কর্মকে পরম মার্গে পৌঁছাও। এই শব্দগুলোর প্রতি গভীরভাবে প্রণিধানে বুঝা যায় যে, বাহ্যত এই আয়াতের শব্দাবলীর মাধ্যমে দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বাহ্যত এতে দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সীরাতে মুস্তাকিম বা সঠিক পথ যাচনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে কিন্তু এর পূর্বে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বলছে যে, এটি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হও। অর্থাৎ, সীরাতে মুস্তাকিম বা সঠিক পথের বিভিন্ন গন্তব্য অতিক্রমের জন্য যথাযথ শক্তিবৃত্তিকে ব্যবহার করে খোদার কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। অর্থাৎ, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বলছে যে, সীরাতে মুস্তাকিম বা সঠিক পথ যদি অর্জন করতে হয় বা সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে যেই শক্তিবৃত্তি প্রদান করেছেন, সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। অতএব বাহ্যিক উপকরণের সাহায্য নেয়া আবশ্যক। যে এটিকে প্রত্যাখ্যান করে সে নিয়ামতের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ। পুণ্য করার জন্যও আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়ার জন্য এমন জিহ্বা দান করেছেন যা হৃদয়ের ধ্যানধারণা ও সংকল্পকে প্রকাশ করতে পারে। অতঃপর বলেন, একইভাবে (আল্লাহ্ তা'লা) হৃদয়ে আকুতি-মিনতি, চিন্তাভাবনা এবং প্রণিধানের বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। অতএব স্মরণ রেখো! আমরা যদি এসব শক্তিসামর্থ্যকে পরিত্যাগ করে দোয়া করি, তাহলে সেই দোয়া আদৌ উপকারী ও কার্যকর হবে না। কেননা, প্রথম দানকে যেখানে কাজে লাগানো হয় নি সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি থেকে কীভাবে লাভবান হওয়া যেতে পারে? তাই اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ -এর পূর্বে إِيَّاكَ نَعْبُدُ বলছে যে, পূর্বে প্রদত্ত তোমার দানসমূহ ও শক্তিসামর্থ্যকে আমরা অকেজো (ছেড়ে দেই নি) এবং নষ্ট করি নি। স্মরণ রেখো! রহমানিয়্যতের বৈশিষ্ট্য হল, তা রহিমিয়্যত থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা দান করে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যে ادْعُونِيأَسْتَجِبْلَكُمْ (সূরা আল্-মু'মিন: ৬১) বলেছেন এটি শুধুমাত্র বুলিসর্বস্ব নয়, বরং মানবীয় সম্মান এরই দাবি করে। যাচনা করা মানুষের বৈশিষ্ট্য আর যেদোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সমীপে চেষ্টা করে না সে সীমালঙ্ঘকারী। অর্থাৎ, যে দোয়া গ্রহণ করানোর বিষয়ে সচেষ্ট থাকে না সে যালেম। দোয়া এমন এক তৃপ্তিকর অবস্থার নাম যে, আমার আক্ষেপ হয়, জগদ্বাসীকে আমি কোন ভাষায় এই পরম আনন্দ ও স্বাদ সম্পর্কে বুঝাবো? এ অনুভূতি কেবল অনুভব করলেই লাভ হয়। সারকথা হল, দোয়ার আবশ্যকীয় উপকরণগুলোর মাঝে প্রধানত যা আবশ্যকতা হল, সৎকর্মশীল হওয়া ও ঈমান সৃষ্টি করা। কেননা যে ব্যক্তি নিজ বিশ্বাসের সংশোধন করে না এবং সৎকর্মের ভিত্তিতে কার্যসাধন করে না, কিন্তু দোয়া করে, এমন ব্যক্তি যেন আল্লাহ্ তা'লার পরীক্ষা নেয়। অতএব মূল কথা হল, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ -এর দোয়ার উদ্দেশ্য হল,আমাদের কর্মসমূহকে তুমি পূর্ণতা দাও, উৎকর্ষ কর। এরপর صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলে আরও সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, আমরা সেই সুপথে পরিচালিত হতে চাই যা পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেণির পথ, আমাদেরকে অভিশপ্তদের পথ থেকে রক্ষা কর, অপকর্মের কারণে যাদের ওপর ঐশী ক্রোধ বর্ষিত হয়েছিল। আর الضَّالِّينَ বলে এই দোয়া শেখানো হয়েছে যে, তোমার সাহায্য হারা হয়ে আমরা বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াব– এরূপ অবস্থা থেকেও আমাদেরকে রক্ষা কর। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৯-২০০, এডিশন ১৯৮৪)*

অর্থাৎ তোমার সাহায্য ব্যতীত পথভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোর হাত থেকেও আমাদেরকে রক্ষা কর। অতএব, সূরা ফাতিহা যখন পড়বেন এভাবে প্রণিধান করে দোয়াও করা উচিত। এরপর তিনি (আ.) দোয়ায় উপকরণের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করে আরও বলেন,

শোন! সেই দোয়া যার জন্য ادْعُونِيأَسْتَجِبْلَكُمْ বলা হয়েছে, এর জন্য এই প্রকৃত প্রেরণাই প্রয়োজন, যদি সেই বিগলন এবং আকুতি-মিনতিতেমজ্জা না থাকে তাহলে তা ট্যাঁ-ট্যাঁ বা বুলিসর্বস্ব বৈ কিছু নয়। এছাড়া কেউ হয়ত বলতে পারে যে, উপকরণ ব্যবহার করা আবশ্যক নয়?– এটি একটি ভুল ধারণা। শরীয়ত উপকরণ (ব্যবহারে) বারণ করে নি। আর সত্যি বলতে– দোয়া কি উপকরণ নয়? অথবা উপকরণ কি দোয়া নয়? উপকরণ সন্ধান করা নিজ সত্তায় এক দোয়া, আর দোয়া স্বয়ং এক মহান উপকরণের ঝরনাধারা। মানুষের বাহ্যিক গঠন– তার দু'হাত, দু'পায়ের গঠন পরস্পরের সহযোগিতার বিষয়ে একটি স্বভাবজ দিক নির্দেশনা। এই দৃশ্য যেখানে স্বয়ং মানুষের মাঝে বিদ্যমান সেক্ষেত্রে এটি কতটা বিস্ময়কর ও আশ্চর্যের কথা যে,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى -র অর্থ বুঝতে তার সমস্যা হবে! হ্যাঁ (আমি এ কথাও) বলি যে, উপকরণের সন্ধানও তোমরা দোয়ার মাধ্যমেই কর। পারস্পরিক সাহায্যের ক্ষেত্রে আমি মনে করি না যে, তোমাদের দেহের মাঝেই যখন আমি খোদা তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক ব্যবস্থাপনা এবং পরিপূর্ণ পথনির্দেশনার ধারা প্রদর্শন করি, তা তোমারা অস্বীকার করবে। আল্লাহ্ তা'লা উপকরণের বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে বিশ্ববাসীর সামনে উন্মুক্ত করার জন্য নবীদের এক ধারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এমনটি করতে সক্ষম ছিলেন আর ক্ষমতাবান যে, তিনি চাইলে সেসব রসূলকে কোন সাহায্যের মুখাপেক্ষী রাখতেন না, কিন্তু তারপরও তাঁদের ওপর এমন একটি সময় আসে যে, তারা مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে) বলতে বাধ্য হয়ে যান। তারা কি এক ভিক্ষুকের ন্যায় সাহায্য যাচনা করে? না, مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ বলার মধ্যেও এক মহিমা থাকে। তাঁরা জগদ্বাসীকে উপকরণের ব্যবহার শেখাতে চান। এসব জাগতিক বস্তু-সামগ্রী সরবরাহ করাও আবশ্যক, যা দোয়ারই একটি শাখা; নতুবা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাদের পূর্ণ ঈমান আর তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা থাকে। তারা জানে যে, আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, আমরা আমাদের রসূলদেরকে এবং তাঁদের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের এই পৃথিবীতে অবশ্যই সাহায্য করব। (সূরা আল মু'মিন: ৫২)তিনি বলেন, এটি একটি নিশ্চিত এবং চিরসত্য প্রতিশ্রুতি। আমি তো বলব, খোদা তা'লা যদি কারও হৃদয়ে সাহায্যের প্রেরণা না যোগান তাহলে কেউ কীভাবে সাহায্য করতে পারে? *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৮-১৬৯, এডিশন ১৯৮৪)*

অতএব নবীদেরও উপায়-উপকরণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু তারা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হন আর এরপর আল্লাহ্ তা'লাই তাদের জন্য উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করেন এবং সুলতানে নাসীর বা সাহায্যকারী প্রেরণ করেন যারা তার কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান।

দোয়ার বরাতে নামাযের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

নামাযের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হল দোয়া, আর দোয়া করা একান্ত আল্লাহ্‌র প্রকৃতির বিধান সম্মত। যেমন- সচরাচর আমরা দেখে থাকি যে, এক শিশু যখন ক্রন্দন করে এবং উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, তখন মা কতটা ব্যাকুল হয়ে তাকে দুধ পান করায়। প্রভুত্ব এবং দাসত্বের মাঝে এমনই একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যা সবার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। মানুষ যখন খোদা তা'লার দরবারে সিজদাবনত হয়ে পরম বিনয় ও আকুতি-মিনতির সাথে তাঁর সামনে নিজের পুরো চিত্র তুলে ধরে আর নিজের চাওয়া-পাওয়া তাঁর কাছেই উপস্থাপন করে, তখন প্রভুর বদান্যতা উদ্বেলিত হয় আর এমন ব্যক্তির প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হয়। খোদার কৃপা এবং বদান্যতার দুধও এক ক্রন্দন চায়, তাই তাঁর কাছে এক অশ্রু বিসর্জনকারী চোখ উপস্থাপন করা উচিত। *(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫২, এডিশন ১৯৮৪)*

এরপর তিনি (আ.) বলেন, কারও কারো ধারণা হল, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আহাজারি ও ক্রন্দনে কিছুই লাভ হয় না। এমন ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত এবং মিথ্যা। এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা এবং গুণাবলী, শক্তি ও ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখে না। যদি তাদের মাঝে সত্যিকার বিশ্বাস থাকত তাহলে তারা এমনটি বলার ধৃষ্টতা দেখাত না। যখন কোন ব্যক্তি খোদার দরবারে আসে আর সত্যিকার তওবা করেছে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর সব সময় কৃপাবারি বর্ষণ করেন। কেউ একান্ত সঠিক বলেছে যে,

'আশেক কে শুদ কে ইয়ার বাহালশ্ নাযার না কারদ্, এ্যা খাজা দারদ্ নিস্ত ওগার না তাবীব হাস্ত।'

অর্থাৎ, 'কেউ সত্যিকার অর্থে ভালবাসবে আর প্রেমাস্পদ তাকাবেই না। হে সাহেব ব্যথাই নেই, নতুবা চিকিৎসক তো উপস্থিত রয়েছে।'

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চান, তোমরা পবিত্র হৃদয় নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে যাও। শর্ত কেবল এতটুকু যে, নিজেকে তাঁর যোগ্য কর। আর সেই সত্যিকার পরিবর্তন যা মানুষকে আল্লাহ্‌র দরবারে যাওয়ার যোগ্য করে, তা নিজের মাঝে সৃষ্টি করে দেখাও। আমি তোমাদের সত্য সত্য বলছি, আল্লাহ্‌র সত্তায় বিস্ময়কর সব শক্তি রয়েছে। আর তাঁর মাঝে অনন্ত কৃপা এবং কল্যাণরাজি রয়েছে, কিন্তু তা দেখা ও পাওয়ার জন্য ভালবাসার চোখ সৃষ্টি কর। যদি সত্যিকার ভালবাসা থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন এবং সাহায্য ও সমর্থন করেন।

(মালফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫২-৩৫৩, এডিশন ১৯৮৪)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "মু'মিনদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً

অর্থাৎ, মু'মিন হল তারা 'যারা আল্লাহকে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় এবং নিজেদের বিছানায় শায়িত অবস্থাতেও স্মরণ করে, আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যেসব অদ্ভুত সৃষ্টি রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও প্রণিধান করতে

থাকে। আর যখন খোদার সৃষ্টির সূক্ষ্ম রহস্য তাদের কাছে উন্মোচিত হয় তখন তারা বলে, হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি কর নি। অর্থাৎ যারা বিশেষ মু'মিন তাদের সৃষ্টিকে বুঝা ও জোতির্বিজ্ঞানের রহস্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য জগতপূজারী লোকদের ন্যায় কেবল এতটুকু নয় যে, পৃথিবীর আকৃতি এরূপ, এর ব্যাস এতটা এবং এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এমন। আর সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির সাথে এটির এরূপ সম্পর্ক রয়েছে, বরং তারা সৃষ্টির ঔৎকর্ষ অনুধাবনের পর এবং তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশিত হওয়ার অন্তরালে যে স্রষ্টা রয়েছেন তার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বীয় ঈমানকে দৃঢ় করেন। *(সুরমা চাশমায়ে আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯১-১৯২)*

অর্থাৎ যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, জ্ঞান অর্জনের পর তারা খোদা তা'লার প্রতি বিনত হয়, এটিই এক মু'মিনের বিশেষ চিহ্ন এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

এ কয়েকটি কথা আমি সেই মহান ধনভাণ্ডার থেকে উপস্থাপন করলাম যা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে দান করেছেন, যার মাধ্যমে দোয়ার গুরুত্ব ও প্রজ্ঞা, দোয়া করার পদ্ধতি ও এর দর্শন, সব বিষয়েই কিছু না কিছু আলোকপাত হয়। আমরা যদি এটি বুঝতে পারি তবে আমরা আমাদের জীবনে এক বিপ্লব সাধন করতে পারব। খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আকৃষ্ট করতে পারব। অতএব, আমাদেরকে এই রমযানে চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর আদেশানুযায়ী চলি এবং স্বীয় ঈমানকে দৃঢ়তর করতে থাকি। দোয়ার করার প্রজ্ঞা ও দর্শনকে অনুধাবনকারী হতে পারি। স্বীয় কর্মের সংশোধনকারী হতে পারি এবং ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গৃহীত হয়। এই রমযান যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থায় এক বিপ্লব সাধনকারী হয়। নিজ ভাইদের জন্যও দোয়া করুন, পূর্বেও আমি ক্রমাগতভাবে দোয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছি। পাকিস্তানে হোক, বা আলজেরিয়াতে, বা অন্য যে কোন স্থানে হোক না কোন, বিশেষভাবে জামা'তী বা ধর্মীয় কারণে যে সমস্যাবলীতে জর্জরিত (তার জন্য দোয়া করুন)। পাকিস্তানে তো দৈনিকই কোন না কোন অঘটন ঘটে থাকে, যেখানে কোন না কোন ভাবে আহমদীদের কষ্ট দেয়া হয়, তাই তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে আলজেরিয়াতেও সম্ভবত পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা খোলার পাঁয়তারা চলছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সুরক্ষিত রাখুন। অন্যের জন্য দোয়া করলে নিজের দোয়া গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থাপত্রটি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। বরং যারা অন্যদের জন্য দোয়া করে তাদের জন্য ফিরিশ্‌তারা দোয়া করেন, আর ফিরিশ্‌তারা যদি দোয়া করে তাহলে এটি অনেক লাভজনক ব্যবসা। অতএব, আমাদেরকে শুধু নিজেদের জন্য নয়, অন্যদের জন্যও বিশেষভাবে অনেক দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই রমযানে বিশেষভাবে এই তৌফিকও দান করুন, আমীন। *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৭ মে ২০২১, পৃষ্ঠা: ০৫-১১)*

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন

www.theahmadi.org

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

১৪ মে ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ঈদুল ফিতরের খুতবা

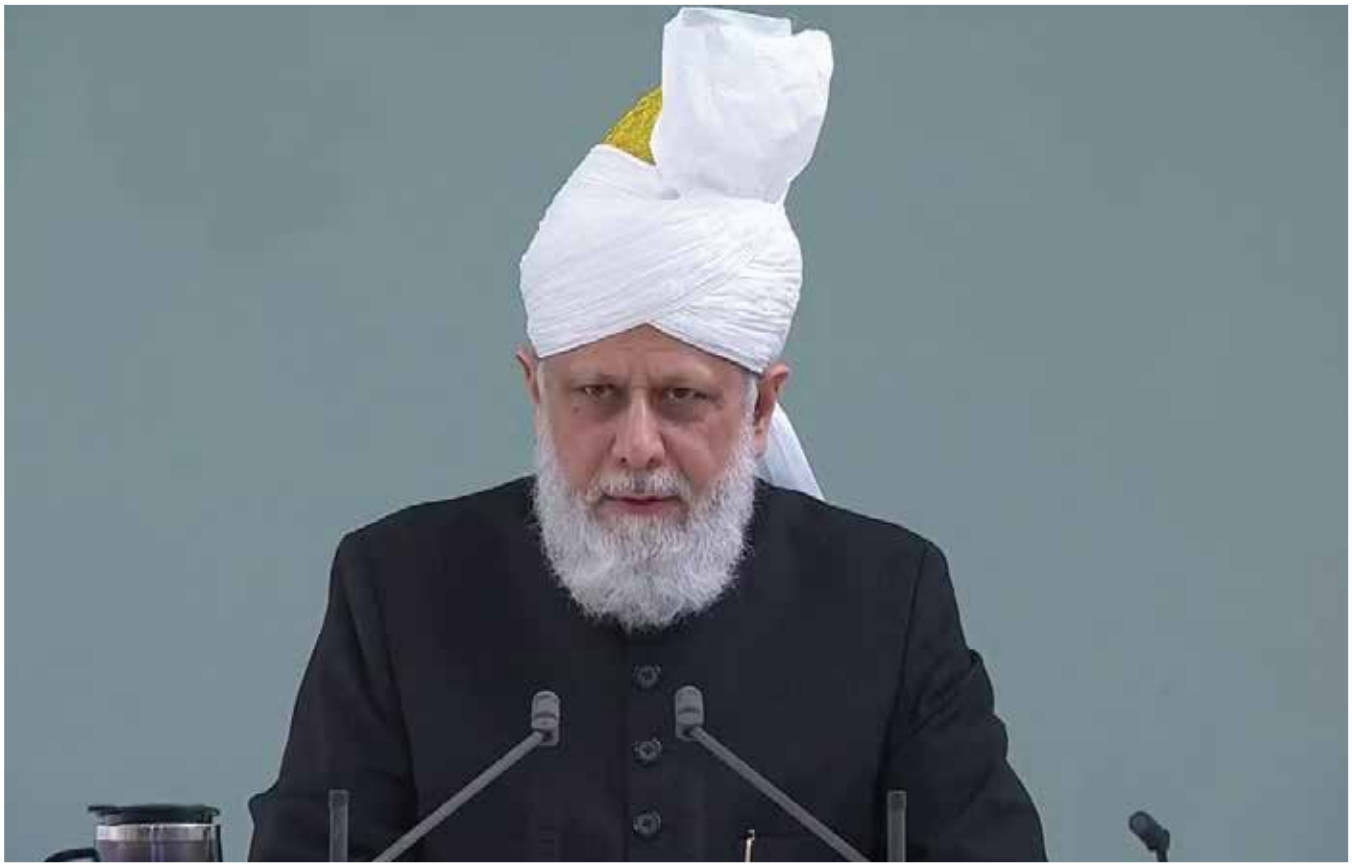

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযল ও কৃপা যে, তিনি আমাদেরকে রমযান মাস অতিক্রম করে আজ ঈদের দিন দেখার সৌভাগ্য দিয়েছেন। কিন্তু এই রমযানের উদ্দেশ্য কেবল এটিই ছিল? আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের পক্ষ থেকে কেবল এতটুকুই কি চাওয়া ছিল যে, আমরা এই ত্রিশ দিন রোযা রাখলাম আর ঈদ উদ্‌যাপন করলাম, আনন্দ করলাম আর খাওয়া দাওয়া করলাম, খেলাধুলা করলাম। আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহ প্রকৃতপক্ষে আমরা তখন অর্জনকারী হতে সক্ষম হব যখন রমযানের রোযা এবং এই ঈদ আমাদেরকে মূল উদ্দেশ্য অনুধাবনকারী বানাবে অর্থাৎ রমযানের ঈদের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য সেটি। যে বরকত এবং পবিত্র পরিবর্তন আমরা অর্জন করেছি, সত্যিই যদি করে থাকি তাহলে ত্রিশ রোযার পর এ বিষয় দৃষ্টিগোচর হওয়া আবশ্যক। এক রমযানের পর পরবর্তী রমযানের জন্য অপেক্ষা করা, মহানবী (সা.) বলেছেন, এর মাঝে ঐসকল পবিত্র পরিবর্তনের ওপর আমল করে অতিক্রম করা উচিত যেন এই কল্যাণ সদা বহমান থাকে। এ যুগে আমাদের সৌভাগ্য হল, আমরা যুগ ইমামকে মান্য করেছি যিনি আমাদের এমন পথ প্রদর্শন করেছেন যা আমাদেরকে সদা সেই পথে পরিচালনাকারী যে পথ আল্লাহ্ তা'লা

এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি আমরা তদনুযায়ী আমল করি তাহলে আমরা উক্ত বিষয় পালনকারী হতে পারব, আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য আদেশাবলীর ওপর আমলকারী এবং তাঁর অধিকার প্রদানকারী হতে পারব। প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা এবং আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা বুঝতে সক্ষম হব এবং তা থেকে কল্যাণলাভকারীও হতে সক্ষম হব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন, আমি দুটি উদ্দেশ্যে আগমন করেছি। প্রথমত বান্দাকে খোদার সাথে সাক্ষাত করানোর জন্য আর দ্বিতীয়ত বান্দাকে বান্দার নিকটবর্তী করার জন্য, তাদের অধিকার অনুধাবন করানোর জন্য, মানব কল্যানের উদ্দেশ্যে, তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য, তাদের দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য আর এই উদ্দেশ্য দু'ভাবে পূর্ণ হতে পারে প্রথমটি হল, হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করা, বান্দাকে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করানো আর দ্বিতীয়ত হুকুকুল ঈবাদ, যার অর্থ একটু আগে আমি কিছুটা উল্লেখ করেছি অর্থাৎ কীভাবে হুকুকুল ঈবাদ প্রদান করা যায়। যদি এ উভয় অধিকার প্রদান করার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে আমরা সফল মানুষ হতে সক্ষম হব, প্রকৃত মু'মিন হতে সক্ষম হব আর ইসলামী তা'লীমের এটিই সারাংশ আর এটিই এক মু'মিনের চিহ্ন। আর এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যার মাঝে রমযান মাসের রোযাও একটি। অর্থাৎ মানুষ কীভাবে চেষ্টা-সাধনা করে এই উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে তার মাঝে একটি হল, রমযানের রোযা। এরপর আছে ঈদের আনন্দ। ঈদের আনন্দ কেবল আনন্দ লাভ করার জন্য নয় বরং এর মাঝেও একটি শিক্ষা রয়েছে। অতএব রমযানের কল্যাণ তখনই লাভ হবে যখন মানুষের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন স্থায়ীভাবে সৃষ্টি হবে। আর ঈদের আনন্দ তখনই লাভ হবে যখন এই পরিবর্তন সর্বদার জন্য জীবনের অংশ হয়ে যাবে। এক মুসলমান প্রকৃত মু'মিন তখন হতে পারে যখন হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ঈবাদ আদায়ের প্রতি দৃষ্টি থাকবে। যেভাবে আমি বলেছি, আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আমরা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকারের দাস এবং এ যুগের ইমামকে মান্য করেছি আর তিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। একজন প্রকৃত মু'মিনের কেমন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে তাঁর (আ.) লেখনীর আলোকে কিছুটা উল্লেখ করব যে, আমরা রমযানের কল্যাণ জারি রাখা এবং প্রকৃত আনন্দ উদ্‌যাপনকারী কীভাবে হতে পারি। কোন্ সেই মান যা আমাদেরকে প্রকৃত ঈদ উদ্‌যাপনের জন্য অর্জন করা আবশ্যক। আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র কী অধিকার আছে আর বান্দার একে অপরের ওপর কী অধিকার আছে? এই জ্ঞান যদি লাভ হয়ে যায় আর এই উভয় অধিকার সঠিক অর্থে যদি প্রদান করা হয় তাহলে এটিই হবে প্রকৃত ঈদ আর এই প্রকৃত ঈদের সাথে সাথে এ জগতও আমাদের জন্য জান্নাত হয়ে যাবে। আমরা দাবী করি যে, আমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসি এবং তাঁর ঈবাদাত করি। কিন্তু এই ভালবাসার মান কেমন হওয়া উচিত যা লাভ করে খোদা লাভ হয়? এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "খোদার সাথে ভালবাসা- এ কথার অর্থ কী? এর অর্থ হল, নিজ পিতা-মাতা, নিজ স্ত্রী, নিজ সন্তানসন্ততি, নিজ প্রবৃত্তি মোটকথা সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে এতটা স্মরণ কর, যতটা তোমরা নিজ পিতৃপুরুষকে স্মরণ করে থাক বরং এর চেয়ে অধিক। আর গভীর প্রেমাবেগে স্মরণ কর। *(সূরা আল্ বাকারা: ২০১)*

এমনটি তখনই সম্ভব যখন মানুষ এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় আর এ বিষয়টি যদি সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন আমরা বলতে পারি যে, আমাদের ঈদ প্রকৃত ঈদ। অতএব এ ক্ষেত্রে আত্মপর্যালোচনা করা আবশ্যক তথা আমরা কি এর জন্য প্রস্তুত? আমরা কি এর জন্য চেষ্টা-সাধনা করেছি? এই ভালবাসার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক হল, আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ কর। আর এই ভালবাসা ততক্ষণ সাব্যস্ত হতে পারে না যতক্ষণ না কার্যত তা প্রমাণ করতে সক্ষম হও। কেবল বুলিসর্বস্ব হলেই তা সাব্যস্ত হয় না। যদি কেউ মিষ্টির নাম নেয়, চিনি বা কোন মিষ্টির নাম নেয় তাহলে নাম নেয়াতেই মুখ মিষ্টি হয়ে যায় না। অর্থাৎ সে মিষ্টতা থেকে স্বাদ পায় না। অথবা মুখে কারও বন্ধুত্ব স্বীকার করা হল কিন্তু বিপদের সময় তার সাহায্য-সহায়তা না করে হাত গুটিয়ে রাখা হল, তাহলে প্রকৃত বন্ধু বলে পরিগণিত হওয়া যায় না। এমনইভাবে খোদা তা'লার তৌহিদের বিষয়ে মুখে স্বীকারোক্তি দিলে এবং পাশাপাশি খোদা তা'লাকে ভালবাসার বিষয়টি মুখে স্বীকার করলে কোন লাভ নেই বরং মৌখিক স্বীকারোক্তির জায়গায় কার্যত প্রমাণ আবশ্যক। (বুলিসর্বস্ব হলে কোন লাভ নেই। আমল দ্বারা প্রমাণ করে দেখাও যে, আল্লাহ্‌কে তুমি ভালবাস।) এ কথা দ্বারা এটিও ভাবা ঠিক না যে, মৌখিক স্বীকারোক্তির কোন প্রয়োজন নেই। (মৌখিক স্বীকারোক্তিও আবশ্যক)। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হল, মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি কার্যত প্রমান করাও আবশ্যক। এ কারণে আবশ্যক যে, খোদা তা'লার পথে নিজ জীবন উৎসর্গ কর অর্থাৎ ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার করেছ, তা সদাসর্বদা দৃষ্টিপটে রাখ। (যারা ওয়াকফে যিন্দেগী, তারা যেন নিজেদের ওয়াকফের উদ্দেশ্য অনুধাবণ করে এবং তা সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই সকল কাজ করতে হবে।) তিনি (আ.) বলেন, এটিই ইসলাম। এটিই সেই উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব যে

এখন এই ঝর্ণার কাছে না আসে যা খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করেছেন, সে সুনিশ্চিত হতভাগা থেকে যাবে। যদি কিছু নিতে হয় আর উদ্দেশ্যে সফল হতে হয় তাহলে সত্যিকারের অন্বেষীর উচিত, সে যেন উক্ত ঝর্ণার দিকে ধাবিত হয় আর সম্মুখে চলতে থাকে আর এই বহমান ঝর্ণায় মুখ লাগায়। যতক্ষণ খোদা তা'লার সামনে দম্ভের বস্ত্র খুলে রবুবিয়্যাতের আস্তানায় সিজদাবনত হওয়া না হবে আর এই অঙ্গীকার করা না হবে যে, জাগতিক প্রভাব প্রতিপত্তি চুলোয় যাক আর বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়ুক, তবুও খোদাকে পরিত্যাগ করব না আর খোদা তা'লার পথে প্রত্যেক ধরনের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকব। ইব্রাহীম (আ.)-এর এই মহান নিষ্ঠাই ছিল যে, তিনি পুত্র কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। ইসলামের উদ্দেশ্য এটিই যে, বহু ইব্রাহীম সৃষ্টি করতে হবে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের ইব্রাহীম হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, আমি তোমাদের সত্য সত্য বলছি, তোমরা ওলী পুজারী হয়ো না বরং ওলী হও আর পীর পুজারী হয়ো না বরং পীর হও। (আল্লাহ্ তা'লার সাথে তোমাদের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উপনীত কর যেন খোদা তা'লার সাথে তোমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়)। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা সেই পথে আস যা নিঃসন্দেহে সংকীর্ণ পথ (এটি অনেক কঠিন কাজ) কিন্তু এ পথে প্রবেশ করেই প্রশান্তি লাভ হয় তবে আবশ্যক হল, এই পথে নিজেকেও হালকা-পাতলা হয়ে প্রবেশ করতে হবে। (মানুষের মাঝে অনেক অহংকার, দম্ভ এছাড়া অনেক মন্দ বিষয় থাকে, সেগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে হবে) অনেক বড় বোঝা মাথায় থাকলে তা কষ্টসাধ্য। যদি সেই পথে অতিক্রম করতে চাও তাহলে সেই বোঝা তথা জগতপ্রীতির বোঝা নিক্ষেপ কর। আমাদের জামা'তের যে খোদা তা'লাকে খুশি করতে চায়। তার উচিত হবে তা ছুঁড়ে ফেলা। স্মরণ রাখবে! তোমাদের মাঝে যদি বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠা না থাকে তাহলে তোমরা মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবে। আর আল্লাহ্‌র সম্মুখে পুণ্যবান সাব্যস্ত হবে না। এমতবস্থায় শত্রুর পূর্বে সে ধ্বংস হবে যে বিশ্বস্ততাকে পরিত্যাগ করে বিশ্বাসঘাতকতার পথ গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'লা ধোঁকায় পড়েন না আর তাঁকে কেউ ধোঁকা দিতেও পারে না। তাই আবশ্যক হল, তোমরা সত্যিকারের নিষ্ঠা ও সততা সৃষ্টি কর। অতএব খোদা তা'লার সাথে আমাদের এই সম্পর্ক আর এই ভালবাসা-ই আমাদের সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতে এবং তা সঠিক অর্থে পূর্ণকারী এবং তদনুযায়ী আমলকারী বানাতে পারে। যদি এমন ভালবাসা না থাকে তাহলে এই অঙ্গীকার আমাদেরকে ধোঁকার মাঝে রাখবে। অতএব আমাদের আত্মপর্যালোচনা করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের ভালবাসার মান কোন্ পর্যায়ে আছে? আল্লাহ্‌র সাথে প্রকৃত ভালবাসার উন্নত মানই আমাদেরকে ঈদের প্রকৃত আনন্দ প্রদানকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জনের জন্য আবশ্যক হল, আমাদের মনোযোগ ইস্তেগফার, তওবা এবং নামাযের দিকে যেন থাকে। এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, ইস্তেগফার করতে থাক আর মৃত্যুকে স্মরণ রাখ। মৃত্যু বৈ ঘুম থেকে জাগানোর আর বড় কোন জিনিস নেই। মানুষ যখন সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে খোদার দিকে মনোযোগী হয় তখন খোদা নিজ অনুগ্রহে কৃপা করেন। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র কাছে সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে তওবা করে তখন আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। তখন বান্দার নতুন হিসাব শুরু হয়। মানুষ যদি সামান্যও কোন পাপ করে তাহলে (ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি) সারা জীবন তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে আর মুখে ক্ষমা করে দেয়ার কথা বললেও যখন সে সুযোগ পায় তখন তার বিদ্বেষ ও শত্রুতার বহির্প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু খোদা তা'লা এমন এক সত্তা, বান্দা যখন সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে খোদার দিকে ধাবিত হয় তখন তিনি তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, কৃপাবারি বর্ষণ করেন এবং তার পাপের শাস্তি ক্ষমা করে দেন। তাই তোমরাও এমন হয়ে যাও যেমনটি পূর্বে ছিলে না। নামায ধীরেসুস্থে পড়ো। তোমাদের হৃদয় যেন আবেগআপ্লুত হয় এবং খোদাভীতি বিরাজ করে। এরপর বলেন, সদা তোমাদের হৃদয়ে খোদার ভয় থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক কাজ করার পূর্বে ভেবেচিন্তে দেখ যে, এই কাজ করার ফলে খোদা সন্তুষ্ট হবেন নাকি অসন্তুষ্ট হবেন। (এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রত্যেক কাজ করার পূর্বে ভেবেচিন্তে দেখ যে, এ কাজ করার ফলে আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হবেন নাকি অসন্তুষ্ট হবেন)। তিনি (আ.) বলেন, নামায খুব আবশ্যকীয় বিষয় এবং মু'মিনের মে'রাজও বটে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করার উত্তম উপায় হল নামায। নামাযের উদ্দেশ্য মাথা টোকানয় অথবা মুরগীর ন্যায় ঠোকর মারা নয়। (অনেক লোক এমন নামায পড়ে থাকে। আবার অনেকে এমন আছেন যারা অন্যের বলায় নামায পড়া শুরু করে। কেউ বলল, নামায পড়ে নাও, অতএব সে নামায পড়ল, তাদের হৃদয় তাদেরকে নামাযে মনোযোগ দিতে বলে না।) এমন নামাযের দ্বারা কোন উপকারিতা নেই। নামায হল, খোদার দরবারে উপস্থিত হওয়া। খোদা তা'লার প্রশংসা করা আর তাঁর কাছ থেকে নিজ গুনাহ্ ক্ষমা করিয়ে নেয়ার সমষ্টিগত নাম নামায।

এখানে তিনি নিজের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, যদি আমাকে এ কথা বলা হয় যে, খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসা ও তাঁর আনুগত্যের কারণে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি প্রদান করা হবে তবে আমি কসম খেয়ে বলছি, আমার স্বভাবজ অবস্থা এমনই হয়ে গিয়েছে যে সে কষ্ট-কাঠিন্যের অবস্থাকে আনন্দ ও ভালবাসার রূপে গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত। আর কষ্ট-কাঠিন্যের রূপে যা-ই প্রদান করা হোক না কেন কখনও খোদা

তা'লার আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বিন্দু পরিমাণও বাহিরে চলে যাওয়া সে কষ্ট-কাঠিন্যকে সীমাহীনভাবে একত্রিত করারই নামান্তর হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন বাদশাহ্ জনসম্মুখে এ ঘোষণা প্রদান করায় যে যদি কোন মা তার সন্তানকে দুধ প্রদান না করে তবে বাদশাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুরস্কৃত করবেন। এটি শুনে একজন মা কখনও সে পুরস্কারের লোভে ও আশায় তার সন্তানের ক্ষতি চাইবে না। অনুরূপভাবে একজন প্রকৃত মুসলমানকে খোদা তা'লার অবাধ্য হবার কারণে অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তাঁর অবাধ্য হওয়াকে সে নিজের জন্য ধ্বংসের কারণ বলে মনে করে। অতএব প্রকৃত মুসলমান হবার জন্য স্বভাবজ অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, খোদা তা'লার ভালবাসা ও আনুগত্য যেন তাঁর প্রদত্ত কোন শাস্তি বা আশার প্রতিশ্রুতির কারণে সৃষ্টি না হয়। বরং প্রকৃতিগত স্বাভাবিক অবস্থা ও তার অংশ হয়ে তা যেন স্বয়ং তার জন্য এক বেহেশতে পরিণত হয়। আর প্রকৃত বেহেশত এটিই। এ পথ অবলম্বন ব্যতীত কোন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এজন্য যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদের আমি এ পথ অবলম্বনের মাধ্যমে (বেহেশতে) প্রবেশ করার জন্য শিক্ষা প্রদান করি। কেননা বেহেশতের (প্রবেশ করার) প্রকৃত পথ এটিই। অতএব প্রকৃত ঈদের আনন্দ হচ্ছে এ বেহেশত। যা অর্জন করার জন্য আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। এ ধরনের ঈদের খুশি উদ্‌যাপন করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি কি না এ ব্যাপারে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। সে বেহেশত লাভ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি কি না। অতঃপর তিনি (আ.) একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃতিগত নীতি এটিই যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনায় ধাপে ধাপে উন্নতি হয়ে থাকে। এজন্য আমাদের জামা'তের উন্নতিও ধাপে ধাপে ও ফসলসদৃশ হবে। অর্থাৎ ফসল যেভাবে ধাপে ধাপে উৎপন্ন হয় ও বৃদ্ধি পায়। আর সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী ফসলের বীজসদৃশ যা জমিতে বোনা হয়ে থাকে। আর সে উচ্চমানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী যেখানে আল্লাহ্ তা'লা একে পৌছাতে চান তা এখনও সুদূর। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে যে উচ্চস্তরে পৌছাতে চান তা এখনও বহুদূর। খোদা তা'লা যে উদ্দেশ্যে ও যে বৈশিষ্ট্যাবলী সৃষ্টির জন্য এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা যতদিন পর্যন্ত অর্জিত না হবে ততদিন পর্যন্ত এর উন্নতি হওয়া অসম্ভব। একত্ববাদের স্বীকারোক্তি, আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা, যিকরে এলাহী, নিজ ভাইয়ের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে যেন বিশেষ মনোযোগ থাকে ।

অতএব বয়আত করার পর খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি, যিকরে এলাহী ও নিজ ভাইয়ের অধিকার আদায় ইত্যাদির জন্য আমাদের এক বিশেষ রূপ ধারণ করতে হবে। আর যখন এটি হবে তখনই তা আমাদের প্রকৃত ঈদ বলে গণ্য হবে। আমাদের পর্যালোচনা করা উচিত যে, এগুলো অর্জনের জন্য কি আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা জারী আছে অথবা আমরা সেই বীজ হয়ে যাচ্ছি না তো যা নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, স্মরণ রেখো! মানুষ তখনই সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে যখন সে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারও শত্রু না হয়। তবে খোদা ও তাঁর রসূলের সম্মানের জন্য হলে তা ভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খোদা ও তাঁর রসূলকে সম্মান করে না বরং তাদের শত্রু– তাদেরকে নিজ শত্রু হিসেবে বিবেচনা কর। কিন্তু এটি স্মরণ রেখো! এই শত্রুতার অর্থ এটি নয় যে তুমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রটনা কর, অযথা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কর আর বিনা কারণে তার ক্ষতির অভিপ্রায়ে পরিকল্পনা কর। এটি কর না। বরং তার থেকে পৃথক হয়ে যাও। আর এ বিষয় খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দাও। যখনই কেউ শত্রুতা পোষণ করে তখন তার থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং এ বিষয় খোদা তা'লার নিকট সমর্পণ কর। যদি সম্ভব হয় তবে তার সংশোধনের জন্য দোয়া কর। এটি নয় যে শত্রুর জন্য দোয়া করা যাবে না। তার সংশোধনের জন্য দোয়াও কর। শত্রুতাবশত স্বেচ্ছায় তার সাথে ঝগড়া কর না। অতএব যদি আত্মাভিমান প্রদর্শন করতেই হয় তবে তা যেন অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য হয়। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু এতেও আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল একজন প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তির জন্য যে চরিত্র ও সীমাসমূহ নির্ধারণ করেছেন তা সম্মুখে রাখতে হবে। খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক, তাঁর উপাস্য হবার যে অধিকার তা প্রদান করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা, তাঁর কিতাব তিলাওয়াত করা, অনুধাবন করা ও এর শিক্ষাসমূহের ওপর আমল করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমেও একজন ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হতে পারে। আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-নিষেধের প্রতি কুরআন করীমই আমাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। অতএব ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের জন্য ইবাদতের পাশাপাশি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, অনুধাবন করা ও এর শিক্ষার ওপর আমল করা অত্যাবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কর ও খোদা তা'লার বিষয়ে কখনও নিরাশা পোষণ কর না। মু'মিন ব্যক্তি কখনও খোদা তা'লার বিষয়ে হতাশা পোষণ করে না। এটি কাফেরদের অভ্যাসসমূহের মাঝে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তারা খোদা তা'লার বিষয়ে হতাশা পোষণ করে। আমাদের খোদা **'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।'** কুরআন শরীফের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য এর অনুবাদও পাঠ কর। আর নামাযের অর্থ অনুধাবনের জন্য তা সুন্দরভাবে আদায় কর। নিজ ভাষায়ও দোয়া কর। কুরআন শরীফকে একটি সাধারণ পুস্তকের ন্যায় পাঠ কর না বরং আল্লাহ্‌র বাণী ভেবে তা পাঠ কর। রসূলে করীম (সা.)-এর ন্যায় নামায আদায় কর। নামাযের নির্ধারিত দোয়াসমূহ পাঠের পর নিঃসন্দেহে নিজ ভাষায় নিজের চাহিদাসমূহের বিষয় খোদা তা'লার নিকট উপস্থাপন কর। আর খোদা তা'লার কাছে যাচনা কর। এতে কোন সমস্যা নেই। এতে কখনওই নামায বিনষ্ট হয় না। বর্তমানে

মানুষজন নামাযকে বিনষ্ট করে রেখেছে। নামায তো আদায় করে না বরং ঠোকর মারে। নামায তো মোরগের মত ঠোকর মেরে আদায় করে ফেলে আর নামাযের পর দোয়া করার জন্য অপেক্ষমান থাকে। দোয়া করাই তো নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য। নামায আদায় করার পর দোয়া করলে নামাযের উদ্দেশ্য কীভাবে অর্জিত হয়? একজন ব্যক্তির বাদশাহর দরবারে যাওয়া ও তার প্রকৃত অবস্থা বাদশাহর নিকট পেশ করার সুযোগও হয় কিন্তু তখন যদি সে তার কোন আর্জি পেশ না করে দরবারের বাহিরে গিয়ে পেশ করে তবে তাতে কিইবা লাভ। যারা নামাযে ধীরস্থিরভাবে দোয়া করে না এদের অবস্থা অনুরূপই হয়ে থাকে। তোমাদের যে দোয়া করার মনোবাসনা রয়েছে তা নামাযেই করে নাও এবং তোমাদের দোয়া ও বিনয়কে ধরে রেখো। অতএব নামাযসমূহ ও কুরআন শরীফের প্রতি এভাবে মনোনিবেশ করলেই তা আমাদের প্রকৃত ও চিরস্থায়ী ঈদে পরিণত হবে। আমরা কি এ রমযান মাসে এরূপ ঈদ লাভ করার প্রতিজ্ঞা করেছি? যদি না করি তবে আজ প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমরা আমাদের নামাযসমূহ সুন্দরভাবে আদায় করে, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে ও এতে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে নিজেদের ঈদের আনন্দসমূহকে চিরস্থায়ী করব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, মনোনিবেশ করা ও হাদীসসমূহের ওপর তা প্রাধান্য দেয়া- এ সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করে বলেন, হে আমার প্রিয় জামা'ত! তোমরা নিশ্চিত থাক যে শেষ যুগ চলে এসেছে ও সঠিক বিপ্লবও প্রকাশিত হয়েছে। অতএব নিজেরা ধোকায় নিপতিত হয়ো না এবং খুব দ্রুত ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন কর। কুরআন শরীফকে নিজেদের পথ-প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ কর আর প্রতিটি বিষয়ে তা থেকে দীপ্তি গ্রহণ কর। হাদীসসমূহকেও তুচ্ছজ্ঞান করে অগ্রাহ্য কর না কেননা তা-ও অতি মূল্যবান। সমস্ত হাদীস অগ্রাহ্য করার মত নয়। অনেক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এ সম্পদ একত্রিত হয়েছে। কিন্তু হাদীসের কোন শিক্ষা যদি কুরআন শরীফের বিপরীত হয় তবে তা অগ্রাহ্য কর যেন পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকতে পার। আল্লাহ্ তা'লা অনেক যত্নের সাথে কুরআন শরীফকে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। অতএব তোমরা এ পবিত্র বাণীর মূল্যায়ন কর আর কোন জিনিসকে এর ওপর প্রাধান্য দিয়ো না কেননা এটি সমস্ত ন্যায়পরায়ণতার আধার। কোন ব্যক্তির প্রজ্ঞা ও তাকওয়ার ওপর মানুষের যতটা বিশ্বাস থাকে ঠিক ততটাই প্রভাব তার কথায় মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। এরপর কুরআন শরীফের গুরুত্ব বর্ণনা করে তিনি (আ.) আরও বলেন, যদি আমাদের নিকট কুরআন না থাকত আর হাদীসসমূহকে যাচাই করে সংকলনের কাজ না করা হত আর এগুলোর ওপরই আমাদের ভরসা করতে হত তবে বংশ পরম্পরায় লজ্জায় আমাদের মুখ ঢাকতে হত। আমি যখন কুরআনের বরকতমণ্ডিত শব্দসমূহের মাঝে মনোনিবেশ করেছি তখন এর মাঝে একটি দারুণ ভবিষ্যদ্বাণী দৃষ্টিগোচর হয়েছে আর তা হচ্ছে এখন কুরআনই সর্বোত্তম পঠিত কিতাব আর হয়তো কুরআনের সাথে তুলনা করে ভবিষ্যতে অন্যান্য কিতাবসমূহকে সর্বোত্তম বলা হবে সেসময় ইসলামের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা ও মিথ্যাকে দূরীভূত করার ক্ষমতা এ কুরআনেরই থাকবে আর তখন অন্যান্য কিতাবসমূহ দূরে ঠেলে দেয়ার উপক্রম হবে। ফুরকানের অর্থও এটি। অর্থাৎ এমন কিতাব যা সত্য-মিথ্যার মাঝে প্রভেদকারী সাব্যস্ত হবে আর অন্য কোন কিতাব বা হাদীস এমন মর্যাদার অধিকারী হবে না। এজন্য এখন অন্য সব কিতাবের পরিবর্তে অহর্নিশি কিতাবুল্লাহ্ই (কুরআন) পাঠ কর। সেই ব্যক্তি বড়ই অকৃতজ্ঞ যে অহর্নিশি কুরআনের পরিবর্তে অন্যান্য কিতাবের প্রতি মনোনিবেশ করে। আমাদের জামা'তের সদস্যদের কুরআন শরীফকে ধ্যান-জ্ঞান মনে করে তা পাঠ করার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত। আর অতিরিক্ত হাদীস পাঠ করার প্রবণতাকে যেন ত্যাগ করে। এটি একটি ভুল প্রবণতা যে হাদীসসমূহ পাঠ করার ক্ষেত্রে যে মনোযোগ দেয়া হয় কুরআনের ক্ষেত্রে তা দেয়া হয় না। হাদীসের দরসকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা রয়েছে। বর্তমানে কুরআন শরীফের অস্ত্র ধারণ করার মাঝেই বিজয় নিহিত। এর দীপ্তির সম্মুখে কোন অন্ধকার থাকার সুযোগ নেই। অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) একস্থানে বলেন, যার কুরআনের কোন অংশ মুখস্ত নেই তার অবস্থা এক পরিত্যক্ত ঘরের ন্যায়। তিনি (সা.) আরও বলেন, কুরআন শরীফ দ্রুত পাঠ কর না বরং বুঝে বুঝে পাঠ কর। অতএব এ রমযান মাসে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার প্রতি অনেকের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে আর অনেকেই কিছু অংশ হয়তো মুখস্তও করে থাকবে আর তা মনে রাখার জন্য বারংবার পাঠ করা উচিত। আর এরপর কুরআন শরীফের শিক্ষায় মনোযোগ নিবদ্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। এর নির্দেশাবলীর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। রসুলে করীম (সা.) ও তাঁর প্রকৃত দাস এভাবে বলেছেন, এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ কর আর যখন আমরা মুখস্তকরণ, মনোযোগ নিবদ্ধকরণ ও তা বারংবার পাঠ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করব তখনই আমরা এর অধিকার আদায় করতে সক্ষম হব। আর তখনই আমরা সেটিকে প্রকৃত ঈদ বলতে পারব যখন এ রমযানে আমাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তনের কারণে কুরআন শরীফ বুঝে পাঠ করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আর এ ঈদকে আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করে শেষ করে দেয়া উচিত নয় বরং প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আল্লাহ্ তা'লার এ কিতাবকে বুঝে পাঠ করার মাধ্যমে লাভবান হওয়া উচিত। আর শুধুমাত্র লাভবান হওয়া নয় বরং এজন্য পড়া উচিত যেন এর শিক্ষা প্রণিধান করে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় ও আমাদের প্রতিটি দিন যেন ঈদের দিনের অনুরূপ হয়। নিত্যদিনের জীবনে ইবাদতসমূহ ও কুরআন শরীফকে বুঝে পড়ার যে ব্যবহারিক প্রয়োগ তা তখনই হয়ে থাকে যখন মানুষ বান্দার হকও আদায় করে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা বান্দার হক আদায়ের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন, কাদ আফলাহা মান যাক্কাহা, ওয়া কাদ খাবা মান দাস্‌সাহা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ আত্মার সংশোধন করেছে সে পরিত্রাণ পেয়েছে, আর যে তা করে নি সে বিফল ও ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য এখন তোমাদের জন্য আত্মার শুদ্ধিকরণ কী এটি অনুধাবন করা উচিত। অতএব স্মরণ রেখো! একজন মুসলমানকে আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক প্রদান করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। আর মৌখিকভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলীসমূহের ক্ষেত্রে তাঁকে যেভাবে একক ও অনন্য মনে করা হয় অনুরূপভাবে কর্মের মাধ্যমেও তা প্রদর্শন করা উচিত। আর তাঁর সৃষ্টজীবের সাথে কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা উচিত। আর নিজ ভাইয়ের সাথে ঈর্ষা, হিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। আর পরনিন্দা করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু আমি দেখছি এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া এখনও অনেক সময়ের ব্যাপার। তোমরা খোদা তা'লার সাথে এরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি কর যে তাঁর সাথে মিশে যাও ও তাঁরই হয়ে যাও। আর যেভাবে মৌখিকভাবে এ বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান কর, কর্মের মাধ্যমেও তা প্রদর্শন কর। তোমরা তো এখনও তাঁর সৃষ্ট জীবের অধিকারই পুরোপুরি আদায় করছ না। এমন কতিপয় ব্যক্তি রয়েছে যারা পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত। আর তার চেয়ে দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তিদের তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে ও তাদের সাথে মন্দ আচরণ করে। আর একে অপরের গীবত করে। যদিও তা অনেক গুনাহ্‌র কাজ। নিজেদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ লালন করে। কিন্তু খোদা তা'লা বলেন, তোমরা পরস্পর এক সত্তায় পরিণত হয়ে যাও। আর যখন তোমরা এক সত্তায় রূপ নিবে তখন এটি বলতে পারবে যে তোমাদের আত্মাকে তোমরা পরিশুদ্ধ করেছ। কেননা যতদিন না তোমাদের পরস্পরের বিবাদ দূর হবে ততদিন খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কও সৃষ্টি হবে না। যদিও এ দুটি অধিকারের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার অধিকারই বেশি কিন্তু তাঁর বান্দার সাথে ভাল ব্যবহার করা এটি এক আয়না সদৃশ। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে ভাল ব্যবহার করে না সে আল্লাহ্ তা'লার অধিকারও প্রদান করতে পারবে না। অতএব যেদিন আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এই আকাঙ্খা অনুযায়ী নিজেদেরকে গড়ে তুলব সেদিনই হবে আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদ বা আনন্দের দিন। আর এজন্য আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে। আমরা কি আমাদের ভাইয়ের অধিকার প্রদান করছি? আমরা কি এ অঙ্গীকার করছি যে, ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ্ এ অধিকার প্রদানে সচেষ্ট থাকব? অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফাতিহায় সর্বপ্রথম গুণ রাব্বুল আলামিন উল্লেখ করেছেন। যেখানে সমস্ত সৃষ্টিরাজি অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে একজন মু'মিন ব্যক্তির সহানুভূতির মাঠ এতটা বিস্তৃত হওয়া উচিত যে সমস্ত সৃষ্টিকুল যেন তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর দ্বিতীয় গুণ হিসেবে রহমান উল্লেখ করেছেন। যেটি থেকে এ শিক্ষা নেয়া যায় সমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি থাকা উচিত। আর রহীমও নিজ জাতির প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের শিক্ষা প্রদান করে। সূরা ফাতিহাতে আল্লাহ্ তা'লার যেসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এটি যেন তাঁরই চরিত্রের প্রতিচ্ছবি যা থেকে বান্দার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আর তা এরূপ, যদি কোন ব্যক্তি স্বচ্ছল হন তবে তার উচিত সাধ্য অনুযায়ী নিজ জাতির অন্যান্য লোকদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা। অন্যান্য লোক তারা তার পরিচিত ও আত্মীয় হোক বা অন্য যে কেউই হোক না কেন তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি পোষণ করা উচিত নয় এবং অপরিচিত লোকের মত আচরণ প্রদর্শন করা উচিত নয়। বরং তোমাদের প্রতি তাদের যে অধিকার সেই অধিকারসমূহের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। যদি একজন ব্যক্তিরও দারিদ্রতা থাকে তবে তার যে অধিকার রয়েছে তা প্রদান করা উচিত। অতএব যতবারই আমরা নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করি প্রতিবারই অন্যান্য বিষয়াদির সাথে বান্দার হক প্রদান করার বিষয়টিও আমাদের দৃষ্টিপটে থাকা উচিত। আর তখনই আমরা আল্লাহ্‌র অধিকারের পাশাপাশি বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারব। আর তখনই আমাদের ঈদ প্রকৃত ঈদে রূপান্তরিত হতে পারে। অতঃপর ইবাদতসমূহ পালন ও কুরআন শরীফকে বুঝে পড়ার পাশাপাশি বান্দার হক প্রদান করা একজন মু'মিন ব্যক্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, বান্দার অধিকারও দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমত, সে যে ধর্মীয় ভাই হয়ে গেছে। আর সে ভাই, পিতা বা পুত্র যে-ই হোক না কেন। কিন্তু তাদের সবার মাঝে এক ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব রয়েছে আর মানবজাতির প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতি রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস হল, যতক্ষণ শত্রুর জন্য দোয়া করা না হয় ততক্ষণ হৃদয় পরিষ্কার হয় না। উদ'উনি আসতাজিব লাকুম আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নি যে যদি শত্রুর জন্য দোয়া কর তবে তা কবুল করব না। বরং আমার বিশ্বাস তো এটি যে, শত্রুর জন্য দোয়া করাও নবীদের সুন্নত। আর এ দোয়ার ফলেই হযরত উমর (রা.) মুসলমান হয়েছেন। রসূলে করীম (সা.) তার জন্য প্রায়ই দোয়া করতেন। এ কারণে ব্যক্তিগত শত্রুতায় দোয়া না করার মত কৃপণতা দেখানো উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আমার এমন কোন শত্রু নেই যার জন্য আমি দু-তিনবার দোয়া করি নি। আর আমি তোমাদেরকে এটিই বলছি আর শিখাচ্ছি যে, শত্রুর জন্য অবশ্যই দোয়া কর। শত্রুকে কষ্ট দেয়া ও তার জন্য দোয়া না করার মত কৃপণতা দেখানো– এমন আচরণে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হন। এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'লা ততটাই অসন্তুষ্ট হন যতটা অসন্তুষ্টি তাঁর সাথে কাউকে

শরীক করলে হন। আল্লাহ্ তা'লার এ দুটি বিষয়ই অপছন্দ যে মানুষ একজন অপরজন থেকে পৃথক হোক ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হোক। আর এটি সে পন্থাই যে অস্বীকারকারীদের জন্যও যেন দোয়া করা হয়। এতে হৃদয় পরিষ্কার ও প্রশস্ত হয় আর সাহস বৃদ্ধি পায়। এজন্য যতদিন আমাদের জামা'তের সদস্যগণ এ পন্থা অবলম্বন না করবে ততদিন তাদের ও অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। এটি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কারও সাথে ধর্মীয় সূত্রে বন্ধুত্ব করে আর সে ব্যক্তি তার পরিচিতদের চেয়ে আর্থিকভাবে দুর্বল হয় তবে তার সাথে অত্যন্ত কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা উচিত। আর তার সাথে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করা উচিত। কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার মহানুভবতা যে তিনি পুণ্যবানদের সাথে থাকা পাপীদেরকেও ক্ষমা করে দেন। অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তাদের উচিত তোমরা এমন জাতিতে পরিণত হও যাদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ফাইন্নাহুম কাউমুন লা ইয়াশকা জালিসুন। অর্থাৎ তারা এমন জাতি যারা দুর্ভাগা হয় না। এটি এমন শিক্ষার সারাংশ যা তাখাল্লাকু বিআখলাকিল্লাহ্ আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদি আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরস্পরের জন্য দোয়া করার মান এরূপ হয় তবেই তা আমাদের জন্য আনন্দের মুহূর্ত বলে পরিগণিত হবে। অতঃপর বান্দার অধিকারের মানদণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, বাস্তবতা হল বান্দার অধিকারই সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও কঠিন স্তর। কেননা প্রতি মুহূর্তেই তা মোকাবিলা করতে হয় ও এ বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়। এ স্তরে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কিছু বান্দাকে বলবেন, তোমরা আমার সেই মনোনীত ব্যক্তি যাদের প্রতি আমি সন্তুষ্ট কেননা আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খাবার খাইয়েছ, আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তোমারা আমাকে কাপড় পরিয়েছ, আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে পানি পান করিয়েছ, আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা করেছ। তারা বলবে, হে আল্লাহ্! তুমি তো এ বিষয়গুলো থেকে পবিত্র, তুমি কবে এমন ছিলে যে আমরা তোমার সাথে এমন আচরণ করেছি? তখন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, আমার অমুক অমুক বান্দা এমন ছিল আর তোমরা তার দেখাশুনা করেছ এবং এটি এমন এক বিষয় যা আমার জন্য করারই নামান্তর। এরপর আরেকটি দল সামনে আসবে যাদের সম্পর্কে বলা হবে যে, তোমরা আমার সাথে অন্যায় আচরণ করেছ, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খাবার দাও নি, আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে পানি পান করাও নি, আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তোমরা আমাকে কাপড় পরিধান করাও নি, আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা কর নি। তখন তারা বলবে, হে আল্লাহ্ তুমি তো এ বিষয়গুলো থেকে পবিত্র, তুমি কখন এমন ছিলে যে আমরা তোমার সাথে এমন আচরণ করেছি? তখন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, আমার অমুক বান্দা এমন ছিল কিন্তু তোমরা তার প্রতি কোন সহানুভূতি ও ভাল ব্যবহার প্রদর্শন কর নি, যা আমার সাথে না করারই নামান্তর।

মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করা এটি অনেক বড় একটি ইবাদত। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটি অনেক বড় একটি মাধ্যম। তিনি বলেন, যারা দরিদ্রদের সাথে ভাল ব্যবহার করে না এবং তাদের সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, আমার শঙ্কা হয়, কোথাও তারা এই বিপদের সম্মুখীন হয়ে যায়। আল্লাহ্ যে কৃপা করেছেন সেই কৃপার কৃতজ্ঞতা হল সেই সৃষ্টির সাথে সদাচরণ করা, ভাল ব্যবহার করা। অহংকার করে বন্য প্রাণীদের মত দরিদ্রদের যেন পদপিষ্ট করা না হয়। দরিদ্রদের প্রতি মায়া-মমতা ও ভালবাসা খোদার স্নেহ ও ভালবাসাকে আকৃষ্ট করে থাকে। আর এমনটি হলেই তবে সেই ঈদ হবে প্রকৃত ঈদ।

ব্যক্তিগতভাবে জামা'তের সদস্যরা একে অন্যের সাহায্য করে থাকে, জামা'তে তহবিলও আছে বিভিন্ন জায়গায়। যারা স্বচ্ছল আছেন, তাদের উচিত কিছু না কিছু অর্থ সেখানে জমা করা। রোগীদের দেখাশুনা এবং এতিমদের তহবিল আছে। গরীব ছাত্রদের ফান্ড রয়েছে। আমাদের এমন অনেক তহবিল আছে যেগুলো দ্বারা দরিদ্রদের সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়। এসব তহবিলেও জামা'তের সদস্যদের অর্থ জমা করা উচিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় হল, যতক্ষণ এক ভাই অপর ভাইয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতা লাভ হবে না।

ভাইয়ের সাথে যদি হিসাব পরিষ্কার না হয় তাহলে আল্লাহ্‌র সাথে হতে পারে না। খোদার অধিকার ও খোদার প্রাপ্য অগ্রগণ্য কিন্তু খোদার অধিকার দেয়া হচ্ছে কিনা তা বোঝা যাবে সৃষ্টির অধিকার প্রদানের মাধ্যমে। যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের সাথে ব্যবহার স্বচ্ছ রাখে না আল্লাহ্‌র সাথেও তার ব্যবহার স্বচ্ছ নয়। এটি এত সহজ বিষয় নয় বরং কঠিন এক বিষয়। সত্যিকার ভালবাসা এক জিনিস আর কপটতাপূর্ণ জীবন ভিন্ন জিনিস। দেখ! মু'মিনের প্রতি মানুষের অনেক কিছু করণীয় আছে। সে যখন অসুস্থ হয় তখন তার সেবা করা উচিত, মারা গেলে তার জানাযায় যাওয়া উচিত, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ না করে বরং ক্ষমা করা উচিত। প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ না থাকলে জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধই আমাদের স্থায়ী আনন্দের কারণ হতে পারে এবং আমাদেরকে জামা'তের অংশ করতে পারে যা অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

অতঃপর ঘরের মাঝে একজন মু'মিনের আচার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত এবং নারীদের সাথে ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে তিনি (আ.) বলেছেন,

অশ্লীলতা ছাড়া মহিলাদের বাকি সকল বক্রতা সহ্য করা উচিত। পুরুষ হয়ে মহিলাদের সাথে মারামারি করা আমার নিকট চরম নির্লজ্জতার কাজ মনে হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুরুষ বানিয়েছেন, এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের পূর্ণতা বৈকি আর সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতার দাবী হল, মহিলাদের সাথে বিনম্র আচরণ করা। ঘরের এই সুন্দর ব্যবহারই ঘরকে জান্নাতপ্রতীম করে তোলে। এভাবে ছেলে-মেয়েদের তরবিয়ত হতে থাকে। ঘরের পরিবেশও সুন্দর থাকে। মু'মিনের জন্য এটি অনেক আনন্দের কারণ হওয়া উচিত যে, তার ঘর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষার আদলে উন্নতি করে। ঘরের এই সুন্দর পরিবেশই মানুষের জন্য প্রতিদিন ঈদের পরিবেশ মানুষকে উপহার দেয়। তিনি (আ.) আরও বলেন, আমাদের জামা'ত এ জন্য সৃষ্টি হয় নি যেমনটি অন্য মানুষের জীবন হয়ে থাকে, শুধু বুলিসর্বস্ব দাবি করলাম যে, আমরা আহমদী অথচ বাস্তবে আমল করার বিষয়টি বুঝলাম না, যেমনটি অন্যান্য দুনিয়াদাররা বলে থাকে। কিন্তু তারা নামায পড়ে না, আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না। অতএব আমি তোমাদের নিকট কেবল এটিই চাই না যে, তোমরা মুখেই স্বীকার করবে কিন্তু কোন বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করবে না। এটি একটি অকর্মক অবস্থা। খোদা তা'লা এটি পছন্দ করেন না। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা পরিদৃষ্টে খোদা আমাকে মানুষের সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেছেন। অতএব আমার সাথে সম্পর্ক রেখেও যদি কেউ নিজের সংশোধনের চিন্তা না করে এবং বাস্তব আমলের বিষয়ে উন্নতি সাধন না করে বরং মৌখিক স্বীকৃতিকেই যথেষ্ট মনে করে তবে সে তার এ ধরনের আচরণ দ্বারা আমার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে। তাই তোমরা যদি তোমাদের আমল দ্বারা এটি প্রমাণ কর যে, আমার আগমনের কোন প্রয়োজন নেই তবে আমার সাথে সম্পর্ক গড়ার মানে কী? আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইলে আমার আগমনের উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ কর। আর তা এভাবেই হতে পারে যে, খোদা তা'লার সমীপে আন্তরিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন কর। কুরআন করীমের নির্দেশাবলীর ওপর এমনভাবে আমল কর যেভাবে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা আমল করে দেখিয়েছে। কুরআন করীমের সঠিক অর্থ খুঁজে বের কর এবং সেটির ওপর আমল কর। আল্লাহ্ তা'লার নিকট কেবল এটি যথেষ্ট নয় যে, মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করলে অথচ বাস্তবে কোন আমল করলে না। মনে রেখ! খোদা তা'লা যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তা আমল ব্যতিত জীবিত থাকতে পারে না। এটি সেই মহান জামা'ত যার প্রস্তুতি হযরত আদম (আ.)-এর যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন নবী আসেন নি যিনি এই জামা'তের সুসংবাদ দেন নি। তাই এর মূল্যায়ন কর আর এর মূল্যায়ন হল, নিজের আমল প্রতিষ্ঠা কর। আমল দিয়ে প্রমাণ কর যে, তোমরাই প্রকৃত জামা'তের সদস্য। আমরা যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি, তাঁকে মান্য করেছি, এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়। কেবল বাহ্যিকভাবে আনন্দ উদ্‌যাপন করলে এর উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না। কেবল বয়আত করলে উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না বরং এর জন্য আমাদের চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতে হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'লার ফযল বর্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ বর্ষিত হলে এবং আমরাই যে এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী তা প্রমাণিত হলে এর চেয়ে বেশি খুশি বা ঈদের দিন আর কিইবা হতে পারে! অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, এটি আমি অনেকবার বলেছি, তোমরা পরস্পর মিলেমিশে থাক। আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে এটিই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা এক সত্তা হয়ে থাক অন্যথায় বিভক্ত হয়ে যাবে। নামাযে একত্রিত হয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ এজন্য যেন পরস্পর ঐক্য সৃষ্টি হয়। যাতে একজনের পুণ্য আরেকজনের মাঝে প্রবাহিত হতে পারে। ঐক্য যদি না থাকে তবে তোমরা হতভাগা রয়ে যাবে। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাক এবং অপরের জন্য গোপনে দোয়া কর। কোন ব্যক্তি যদি কারও জন্য গোপনে দোয়া করে তবে ফিরিশতারা বলে, তোমার জন্যও এমনটি হোক। কতইনা মহান দোয়া! মানুষের দোয়া যদি কবুল না-ও হয় তবে ফিরিশতাদের দোয়া তো কবুল হয়ে থাকে। তাই আমি তোমাদেরকে নসীহত করছি বরং বলতে চাই, তোমাদের মাঝে যেন কখনও বিভেদ সৃষ্টি না হয়। আমি কেবল দুটি জিনিস নিয়েই এসেছি। একটি হল, খোদার তৌহিদ এবং অপরটি হল, পরস্পরের মাঝে ভালবাসা স্থাপন করা। সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখাও যা অন্যদের জন্য অলৌকিক নির্দশন হবে। এটিই সেই দলিল যা সাহাবীদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল যে, কুনতুম আ'দাআ ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম। মনে রেখ! প্রীতি একটি মহা সম্মান। তোমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ কর তা যদি তোমাদের ভাইয়ের জন্যও পছন্দ না কর তাহলে স্মরণ রেখ! তোমরা আমার জামা'তভুক্ত নও। তারা সমস্যা ও বিপদ কবলিত। তিনি বলেন, ছোট ছোট বিষয়ে বিবাদ হয়ে থাকে। মনে রেখ! বিদ্বেষ পরিহার করা মাহদীর আলামত। এই আলামত কি পূর্ণতা পাবে না? অবশ্যই পাবে। কিন্তু আমরা যদি পরিবর্তিত না হই তাহলে এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবো। তিনি (আ.) বলেন, আমার সত্তা থেকে ইনশাআল্লাহ্ একটি পুণ্যবান জামা'ত সৃষ্টি হবে।

তিনি (আ.) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির কারণে নিজের ঘাড়ে অপবাদ নিতে পারি না। কোন ব্যক্তি যদি জামা'তের সদস্য হয়ে আমার উদ্দেশ্য অনুযায়ী না চলে তবে সে একটি শুষ্ক কাণ্ড। সেটিকে মালি কেটে ফেলবে না তো কী করবে! শুষ্ক কাণ্ড অন্যদের সাথে থেকে পানি শোষণ করে ঠিকই কিন্তু সেটিকে সবুজ-শ্যামল করতে পারে না বরং অন্যকেও নিজ সদৃশ বানিয়ে থাকে। অতএব অনেক ভয় করা প্রয়োজন। আমাদের ঈদ ততক্ষণ প্রকৃত ঈদ হতে পারে না যতক্ষণ আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন

করে বান্দার অধিকার আদায় করে পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের আমল সংশোধন করব। কেবল গুটিকতক আত্মীয়স্বজনদের সাথে সাক্ষাত করে বা তাদের অধিকার আদায় করলেই প্রকৃত ঈদ উদ্‌যাপন হয় না। প্রকৃত ঈদ উদ্‌যাপন করার জন্য আমাদের এটি খতিয়ে দেখতে হবে যে, আমরা কতটা নিজেদের মাঝে ভালবাসা ও প্রীতি সৃষ্টি করতে পেরেছি? অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, হে সৌভাগ্যশালীরা! তোমরা দ্রুত এই জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও যা তোমাদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান কর। এই পৃথিবী ও আসমানের কোন কিছুর সাথে তাঁকে শরীক কর না। খোদা তা'লা বস্তুনির্ভর হতে নিষেধ করে না কিন্তু যারা কেবল বস্তুর ওপরই নির্ভর করে তারা মুশরিক। আদি থেকে খোদা তা'লা বলে আসছেন, পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী না হলে পরিত্রাণ নেই। অতএব তোমরা পবিত্র হয়ে যাও এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও হিংসাপরায়ণতা থেকে মুক্ত হয়ে যাও। মানুষের নফসে আম্মারাহ্ তে অনেক ধরনের নোংরামি থাকে। সবচেয়ে বড় পাপ হল অহংকার করা। যদি অহংকার না থাকত তাহলে কেউ কাফির হত না। অতএব তোমরা হৃদয়ের দিক থেকে প্রশান্তির কারণ হয়ে যাও। তোমরা পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টি কর। তোমরা যে পৃথিবীতে বেহেশত দেওয়ার ওয়ায করে থাক তার একটি মাধ্যম হল, মানবজাতির জন্য মঙ্গল কামনা করা। আল্লাহ্ তা'লার অধিকারসমূহ আন্তরিক ভয়ের মাধ্যমে পালন কর অন্যথায় তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। নামাযে অনেক দোয়া কর যাতে খোদা তোমাদের নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং তোমাদের হৃদয় পরিষ্কার করেন কেননা মানুষ দুর্বল। খোদার শক্তিবলে প্রত্যেক পাপ দূরীভূত হয়ে থাকে। খোদার শক্তি না থাকলে মানুষ কোন পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে না। ইসলাম কেবল এটির নাম নয় যে, রীতিসর্বস্ব কলেমা পড়ে নিলেই হয়ে গেল বরং প্রকৃত ইসলাম হল, তোমাদের আত্মা যেন খোদার দরবারে বিনত হয় এবং খোদা যেন সব দিক থেকে তোমাদের নিকট অগ্রগণ্য হয়। অতএব এটি সেই শিক্ষা যা আমাদের প্রকৃত ঈদ প্রদান করতে পারে। আমরা যদি এর ওপর আমল করতে পারি তাহলে কেবল তখনই তা আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদের দিন হতে পারে কেননা আমরা খোদার প্রকৃত বান্দা হবার জন্য তাঁর নির্দেশাবলী পালনের চেষ্টা করব। আর তখন আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের চেয়ে বেশি আমাদের দান করবেন। আমরা যখন কুরআন করীম পড়ে ও বুঝে এর ওপর আমল করার চেষ্টা করব তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের ভাগীদার করবেন। আমরা যখন বান্দার অধিকার আদায় করব তখন তিনি আমাদের প্রতিও ভালবাসার দৃষ্টি প্রদান করবেন। আর এ জিনিসগুলো যদি পাওয়া যায় তবে সেটিই প্রকৃত ঈদ। দোয়া এবং চেষ্টা থাকা উচিত যাতে এই প্রকৃত ঈদ আমরা পালন করতে পারি।

পরিশেষে আমি সবাইকে দোয়ার করার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। প্রথমত ফিলিস্তিনবাসীর জন্য দোয়া করুন যাদের সাথে বর্তমানে অনেক অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে। তাদের নিজেদের মসজিদ তথা মসজিদুল আকসা-তে যেতে হলেও অনুমতি নিতে হচ্ছে বরং অনুমতি দেয়া হয় না তাদেরকে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। যারা সেখানে নামায আদায় করতে গিয়েছে তাদেরকে সরকারি কর্মকর্তারা মেরে বের করে দিয়েছে। তারা সেখানে অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। একইভাবে শেখ যাররা নামক একটি ছোট বসতি যেখান থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। সেটি তাদের নিজেদের এলাকা। এটি নিয়ে সংবাদকর্মীরাও লিখছে বরং ইসরাঈলেও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম যারা ন্যায়পরায়ণ তারা এ বিষয়টি নিয়ে লেখালিখি করছে। পুলিশ সেখানে কাঁদানে গ্যাস মেরেছে এবং গোলাগুলি করেছে। তারা বাহ্যত বুঝাতে চাইছে যে, শত্রু নিধন করছে কিন্তু প্রকৃত বিষয় হল, তারা অত্যাচার করছে এবং জনসাধারণকে মারা হচ্ছে। যারা আহত হচ্ছে তাদের বিষয়ে প্রেস-মিডিয়ার ভাষ্য হল, তাদেরকে হাসপাতালেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না। যাহোক, মসজিদুল আকসা-তে যাদের ওপর অত্যাচার-নীপিড়ন হচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা রহমতের চাদরে আবৃত করুন এবং অত্যাচারীদের পাকড়াও করুন। আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট যারা দাবি করে যে, তারা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ অথচ শিশুদের ওপর এমন নির্যাতনের বিষয়ে এখন পর্যন্ত তারা কোন স্টেটমেন্ট দেয় নি। এদিকে অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নিউইয়র্ক টাইমস লিখছে, ইসরাঈলে ইহুদীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। (হুযূর বলেন,) তাদের মাঝে তো ন্যায়বিচার নেই ফলে প্রাধান্য তো দিবেই। একইভাবে হুযূর বিভিন্ন পত্রপত্রিকার রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। একটি পত্রিকা লিখছে, যা আমাদের তা আমাদের আর যা তোমাদের তা-ও আমাদের। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তাদের ওপর রহম করুন। তারা যেন ভাল নেতা পায়। এসব বিষয়ে মুসলমান দেশগুলোরও একত্রিত হওয়া উচিত কিন্তু তারাও তা করছে না। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান দেশগুলোকে হেদায়াত দিন। ফিলিস্তিনীদের জন্য আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত। এছাড়া সারাবিশ্বে যারাই অত্যাচারিত তাদের জন্য দোয়া করুন। পাকিস্তান কিংবা আরব উপমহাদেশে যারাই অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন তাদের জন্য দোয়া করুন। সাধারণভাবে বিশ্ব থেকে অত্যাচার-নিপীড়ন বন্ধ হওয়ার জন্য দোয়া করুন। অভাবীদের জন্য দোয়া করুন। বর্তমানে যে মহামারী চলছে তা থেকে পরিত্রাণের জন্যও দোয়া করুন। আর এ থেকে আমরা তখনই পরিত্রাণ পাব যখন আমরা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

সানী খুতবা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আসুন আমরা দোয়া করে নিই।

[ভাবানুবাদ: পাক্ষিক 'আহমদী' ডেস্ক]

সীরাতুল মাহদী (আ.)

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

(২২তম কিস্তি)

৯৯) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম:** মিয়া আব্দুল্লাহ সানৌরী সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করেন, ১৮৮৯ সালে লুধিয়ানায় প্রথমবার লোকদের বয়আত নেয়ার পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আলীগড় যান। আমি, মীর আব্বাস আলী ও শেখ হামেদ আলী মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথেই ছিলাম। তখন সৈয়্যদ তফাজ্জল হোসেন যিনি একজন তহসিলদার আর তখনকার সময় সেই জেলার সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন, তার বাসায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অবস্থান গ্রহন করেন। সৈয়্যদ সাহেবের পরিচিত সেখানকার একজন তহসিলদার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিমন্ত্রণ করেন, সাথে শহরের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও আমন্ত্রণ জানান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেখানে যান আর যথারীতি আমাদের তিনজনকে তাঁর ডানে এবং বামে বসিয়ে নেন। তহসিলদার সাহেব খাবার পরিবেশনের জন্য ছোট ছোট টেবিলের ব্যবস্থা করেন যার মাঝে খাবার রাখা ছিল। আর লোকেরা তার আশেপাশে বসে যায়। সেই আসনগুলোতে কাঁচের ফুলদানি রাখা ছিল। খাবার খাওয়া শুরু হলে মীর আব্বাস আলী খাবারের দিকে হাত না বাড়িয়ে বরং চুপচাপ বসে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জিজ্ঞেস করলেন মীর সাহেব! আপনি খাবার খাচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, খাবারের এই ধরনটি নিম্নশ্রেণীর মানুষের জন্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, কোন সমস্যা নেই, এটাতো শরীয়ত বিরোধী নয়। তখন মীর সাহেব বলেন, আমার মন চাচ্ছে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মীর সাহেব! আমি তো খাচ্ছি। মীর সহেব বলেন, হযরত! আপনি খান! আমি খাব না। যাহোক, মীর আব্বাস আলী খাবার খায় নি। মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব বলতেন, আব্বাস আলী মুরতাদ হয়ে গেলে আমার এই কথা মনে পড়ে যে, সে তো তখন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন, আলীগড়ের লোকেরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট একটি বক্তৃতা দেয়ার অনুরোধ করে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও এতে সম্মতি প্রদান করেন। বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। যখন এই সংবাদটি প্রচার করা হয় আর সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায় আর বক্তৃতা দেওয়ার সময় নিকটবর্তী হয় তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সৈয়্যদ তফাজ্জল হোসেন সাহেবকে বলেন, এই বক্তৃতাটি না দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার ওপর এলহাম হয়েছে তাই আমি এখন আর বক্তৃতা দিব না। তিনি বললেন, হুযূর এখন তো সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে, লোকদের সামনে তো অপদস্ত হব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যাই হোক না কেন, আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করব। এরপর অন্যান্য ব্যক্তিরাও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট অত্যন্ত তাগিদপূর্ণভাবে নিবেদন করেন কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাদেরও অস্বীকৃতি জানান আর বলেন, এটা কি করে হতে পারে, আমি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশকে অমান্য করব! তাঁর নির্দেশের বিপরীতে আমি অন্য কোন সত্তার ভ্রুক্ষেপ করি না। যাহোক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বক্তৃতা দেন নি। আর খুবসম্ভব সাত দিন সেখানে অবস্থান করে পুনরায় লুধিয়ানায় ফিরে আসেন। খাকসার নিবেদন করছি, মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব সর্বপ্রথম যখন এই উদ্ধৃতিটি বর্ণনা করেন তখন এটি বলেন যে, এই সফরটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৮৪ সালে করেছিলেন। খাকসার হযরত আম্মাজানের নিকট নিবেদন করলে তিনি এতে দ্বিমত পোষণ করেন আর বলেন, এই সফর মিয়া (খলীফাতুল মসীহ্ সানী) জন্মের পর এমনকি প্রথম বয়আতের অনুষ্ঠানের পর হয়েছিল। আমি যখন হযরত আম্মাজানের এই কথাগুলো মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেবকে বলি তখন তিনি প্রথমে তো তার স্মরণশক্তির ওপর অবিচল থাকেন কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর মনে পড়ে যে এটিই (হযরত আম্মাজানের কথাটি) সঠিক। খাকসার নিবেদন করছি, মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব বলতেন, আলীগড় সফরের মাধ্যমে

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই সংকল্প পূর্ণ হয় যা তিনি হিন্দুস্তান ভ্রমণের ব্যাপারে করেছিলেন। খাকসার নিবেদন করছি, এই সফরেই মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল আলীগড়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা করেছে আর পরিশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে একটি বই লিখে কিন্তু সে অত্যন্ত দ্রুত এই ইহধাম ত্যাগ করে। (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর কিতাব ফতেহ ইসলামের টীকার মাঝে এই সফরের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন)।

১০০) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমঃ মিয়া আব্দুল্লাহ সানৌরী সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করেন, সম্ভবত এটা ১৮৮৪ সালের কথা, একবার মে জুন মাসের দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মসজিদে মুবারকে ফজরের নামাজ আদায়ের পর মসজিদ সংলগ্ন একটি গোসলখানায় যা নতুন প্লাস্টার হওয়ার করণে অনেক ঠাণ্ডা ছিল এবং সেখানে একটি চারপাই পাতা ছিল, তার ওপর গিয়ে শুয়ে পড়েন। সেই চারপাইতে বিছানা আর বালিশ কিছুই ছিল না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাথা কিবলার দিকে আর মুখ ছিল উত্তর দিকে। তিনি (আ.) একটি হাত বালিশের মত করে মাথার নিচে দেন আর অপর হাতটি একইভাবে মাথার ওপর দিয়ে ঢেকে নেন। আমি পা টিপতে বসে গেলাম। সেই মাসটি ছিল রমযান মাস, তারিখ ছিল ২৭ এবং দিনটি ছিল জুমুআর দিন। তাই এতগুলো বরকতময় মুহূর্ত একসাথে পাওয়ার কারণে আমার হৃদয় অনেক প্রফুল্ল ছিল। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মত বরকতময় সত্তার সেবা করছি, সময়টাও ফজরের সময় যা বরকতময় একটি মুহূর্ত, আর মাসটিও রমযান মাস যা বরকতময় একটি মাস। পাশাপাশি সেটি ছিল ২৭ তারিখ ও জুমুআর দিন, আর বিগত রাতটি ছিল কদরের রাত। কারণ আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলতে শুনেছিলাম, যখন রমযান মাসের ২৭ তারিখ জুমুআর দিন হয়, তখন সেই রাতটি নিশ্চতরূপে কদরের রাত হয়। আমি এই কথাগুলো স্মরণ করে মনে মনে আনন্দিত হচ্ছিলাম, ঠিক তখনই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শরীর হঠাৎ কেঁপে উঠলো। তারপর হুযূর ধীরে ধীরে মাথার ওপর থেকে কনুই খানিকটা সরিয়ে আমার দিকে দৃষ্টি দেন। তখন আমি দেখি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে আছে। এরপর তিনি পুনরায় তার হাতটি পূর্বের মত রেখে দেন। আমি পা টিপতে টিপতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পায়ের গোছা পর্যন্ত যাই। তখন আমি দেখি, হুযূরের পায়ের গোড়ালীর নিচে একটি শক্তমত জায়গা ছিল, তার ওপর লাল কালির একটি ফোঁটা পড়ে আছে, যা সদ্য পতিত হওয়ার কারণে তখনও ছড়িয়ে পড়ে নি। আমি ডান হাতের তর্জনি দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে গেলাম যে, এটা কী! তখন সেই ফোঁটাটি গোড়ালি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আর আমার আঙ্গুলেও লেগে যায়। তখন আমি এটার ঘ্রাণ নেয়ার চেষ্টা করি যে হয়তো তাতে কোন সুঘ্রাণ থাকবে, কিন্তু তাতে কোনরকম সুঘ্রাণ ছিল না। আমি সেটার ঘ্রাণ এই কারণে নেয়ার চেষ্টা করছিলাম যে, তখনই আমার হৃদয়ে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, হয়তো এটা কোন ঐশী বিষয় আর এই কারণেই তাতে হয়তো কোন সুঘ্রাণ থাকবে। তারপর আমি পা টিপতে টিপতে পাঁজরের কাছাকাছি পৌঁছালে আমি একই রকম লাল কালির বড় একটি ফোটা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কুর্তার ওপরেও দেখতে পেলাম। আমি স্পর্শ করে দেখলাম, তা তখনও ভেজা ছিল। তখন আমি আবারও আশ্চর্য হলাম যে, এই লাল কালি কোথা থেকে এলো? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেন জেগে না যান এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমি ধীরে ধীরে চারপাই থেকে উঠলাম আর খুঁজতে লাগলাম যে, এই লাল কালির ফোঁটা কোথা থেকে পড়েছে? কক্ষটি নিতান্তই ছোট ছিল। ছাদের দিকে আর তার আশেপাশে আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করি, কিন্তু এই লাল কালির ছিটা কোথা থেকে পড়েছে তা বাহ্যত আমি খুঁজে পেলাম না। আমার মনে এমনও ভাবনার সৃষ্টি হয় যে, হয়তো ছাদে কোন টিকটিকির লেজ কেটে গেছে আর সেখান থেকেই রক্ত পড়ছে। তাই আমি অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে পুরো ছাদটা দেখি, কিন্তু এসবের কোন চিহ্নই আমার চোখে পড়ে নি। অবশেষে আমি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম এবং পূর্বের ন্যায় পা টিপতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উঠে সেই কক্ষটি থেকে বেরিয়ে মসজিদে মুবারকে গিয়ে বসলেন। আমি সেখানে পেছনে বসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাঁধ টিপতে থাকি। তখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিবেদন করলম, 'হুযূর! এই লাল কালির ছিটা কোথা থেকে পড়ল?' হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্যমনস্কভাবে বললেন, আমের রস হবে হয়তো। আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, 'হুযূর, এটাতো আমের রস না, এটাতো লাল কালি! তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খানিকটা ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, কিত্থে হ্যাঁ? অর্থাৎ, কোথায়? আমি কুর্তার ওপর সেই চিহ্নটি দেখিয়ে বললাম, এই তো হুযূর।' তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেই কুর্তাটি নিজের দিকে টেনে নেন আর খানিকটা মাথা ঘুরিয়ে কাছ থেকে সেই লাল কালির ফোটাটি দেখেন। তখন তিনি আমাকে সেই সম্পর্কে কিছু না বলে আল্লাহ্ তা'লার দর্শন লাভ আর কাশফি অবস্থার বাহ্যিক জগতে পূর্ণতাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত পূর্ববর্তী বুযূর্গদের দুই একটি ঘটনা আমাকে শোনান। আর বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা অতি সূক্ষ্ম ও গুপ্ত, বাহ্যিক চর্মচক্ষু তাঁকে পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করতে পারে না।** অবশ্য তাঁর কতক জালালী ও জামালী গুণাবলী মূর্ত আকার ধারণ করে বুযূর্গদের চোখে ধরা দেয়। শাহ আব্দুল কাদের সাহেব বলতেন, আমি বহুবার আল্লাহ্ তা'লাকে আমার পিতার রূপে দর্শন

করেছি। শাহ সাহেব আরও বলেন, একবার আমি আল্লাহ্ তা'লার দর্শন লাভ করি এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হলুদের একটি পুঁটলি দিয়ে বলেন, 'এটি আমার মারেফাত (পরিচয়), এটাকে সামলে রেখো।' তিনি যখন জাগ্রত হন তখন দেখেন, হলুদের সেই পুঁটলি তখনও তার হাতের মুঠোয় রয়েছে। নাম না বলে আরও একজন বুযূর্গ ব্যক্তির ঘটনা হুযূর আমাকে শুনান। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সময় তার কক্ষের ভেতর জায়নামাযে বসে কিছু পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি কাশফে দেখলেন যে, কেউ একজন বাহির থেকে এসে তার নিচ থেকে জায়নামায বের করে নিয়ে যায়। কাশফ শেষ হলে তিনি দেখতে পান সত্যিই তার নিচে আর জায়নামাযটি নেই। সূর্যোদয়ের পর তিনি যখন নিজ কক্ষ থেকে বাইরে বের হলেন তখন দেখতে পান যে, সেই জায়নামাযটি উঠোনে পড়ে আছে। এই ঘটনাগুলো শুনিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে বলেন যে, এগুলো কাশফের ঘটনা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সেই সমস্ত বুযূর্গদের মো'জেযা প্রকাশের জন্য বাহ্যিকভাবেও সেগুলো ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। এখন আমার ঘটনা শুনো। তুমি যখন সেই কক্ষে আমার পা টিপছিলে, তখন হঠাৎ আমি অনেক প্রশস্ত আর নির্মল একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম। তার মাঝে একটি সিংহাসন পাতা ছিল, সেই সিংহাসনের ওপর একজন ব্যক্তি বিচারকের বেশে সমাসীন ছিলেন। আমার হৃদয়ে এটি প্রোথিত করা হল তিনি احكم الحاكمين সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক অর্থাৎ رب العالمين সমগ্র জগতের প্রভু। আর আমার এমন মনে হল যেন আমি সেই বিচারকের একজন পেশকার, আমি ভাগ্য ও নিয়তি সংক্রান্ত কিছু নির্দেশাবলী লিখে সেটার ওপর স্বাক্ষর করানোর জন্য তাঁর নিকট যাচ্ছি। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমাকে সিংহাসনের পাশে বসালেন। তখন আমার অবস্থা এমন হল যেমনটি এক হারিয়ে যাওয়া সন্তান বহু বছর পর তার হারানো পিতাকে খুঁজে পায়। স্বভাবতঃই তার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় অথবা সম্ভবতঃ তিনি (আ.) বলেছিলেন- সে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। আর তখন আমার হৃদয়ে এই ধারণারও উদয় হয় যে, ইনি احكم الحاكمين সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক অথবা বলেছেন رب العالمين সমগ্র জগতের প্রভু। কত ভালবাসা আর স্নেহের সাথে তিনি আমাকে পাশে বসিয়েছেন! এরপর আমি সেই সমস্ত নির্দেশাবলী যা আমি লিখেছিলাম, তাতে স্বাক্ষর করানোর জন্য সামনে রাখলাম। তিনি তাঁর কলমটি পাশেই রাখা লাল কালির দোয়াতে ডোবান আর আমার দিকে একটা ঝাড়া দিয়ে স্বাক্ষর করে দেন। মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কলমটি ঝাড়া দেয়া আর স্বাক্ষর করার কাজটি নিজ হাতের ইশারায় দেখাচ্ছিলেন যে, 'এভাবে করেছিলেন। তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটি সেই লাল কালি যা সেই কলম থেকে পড়েছে। তারপর বললেন, দেখতো, তোমার ওপরেও কোন ফোঁটা পড়েছে কিনা? আমি আমার কাপড় এদিক সেদিক দেখে নিবেদন করলাম, হুযূর, আমার ওপর তো কোন ফোঁটা পড়ে নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, তোমার টুপিতে দেখ। তখনকার সময় আমি মখমলের সাদা টুপি পরতাম। আমি টুপি নামিয়ে দেখি সেটির ওপরেও একটি ফোঁটা রয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই আর নিবেদন করি হুযূর! একটি ফোঁটা আমার টুপিতেও পড়েছে! তখন আমার হৃদয়ে এই বাসনা সৃষ্টি হয় যে, এই কুর্তাটি অত্যন্ত বরকতমণ্ডিত একটি কুর্তা, এটাকে তাবার্‌রুক হিসেবে নিয়ে নেয়া উচিত। হুযূর আবার চট করে বারণ না করে বসেন– এই চিন্তায় আমি প্রথমে হুযূরকে জিজ্ঞেস করি, হুযূর! কোন বুযুর্গ ব্যক্তির কাপড় তাবাররুক স্বরূপ নিয়ে রাখা কি বৈধ? হুযূর বলেন, হ্যাঁ, বৈধ। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদত্ত তাবাররুক সাহাবীরা নিজের কাছে রাখতেন। তখন আমি নিবেদন করলাম, হুযূর! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার একটা নিবেদন ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, বল, কী বলবে? আমি নিবেদন করলাম, হুযূর, এই কুর্তাটি তাবাররুকস্বরূপ আমাকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, না, এটা তো আমি দেব না! আমি নিবেদন করলাম, হুযূর, আপনি তো এখনই বলেছেন- রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদত্ত তাবাররুক সাহাবীরা নিজের কাছে রাখতেন। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, আমি কুর্তাটি এই কারণে দিতে চাচ্ছি না যে, আমার এবং তোমার মৃত্যুর পর এর মাধ্যমে শির্ক ছড়াবে আর মানুষজন এর পূজা করবে। লোকেরা এটাকে নিয়ে মাজার বানাবে। আমি নিবেদন করলাম, হুযূর, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদত্ত তাবাররুক থেকে তো শির্ক ছড়ায় নি। হুযূর বললেন, মিয়া আব্দুল্লাহ! প্রকৃত বিষয় হল, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদত্ত তাবাররুক যেই সব সাহাবীদের নিকট ছিল তারা মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়্যত করে গিয়েছিলেন যেন সেই তাবারুকগুলো তাদের কাফনের সাথে দাফন করে দেয়া হয়। আর এমনটিই করা হয়েছিল। প্রদত্ত তাবাররুক যেই সাহাবীর নিকট ছিল তা তাদের কাফনের সাথেই দাফন করা হয়েছিল। আমি নিবেদন করলাম, হুযূর মৃত্যুর সময় অমিও ওসীয়্যত করে যাব এই কুর্তাটি যেন আমার কাফনের সাথে দাফন করা হয়। তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি এই অঙ্গীকার কর তবে নিতে পার। যেহেতু সেটা জুমুআর দিন ছিল তাই হুযূর খানিক পরেই গোসল করে কাপড় পরিবর্তন করেন আর তখন আমি সেই কুর্তাটি সামলে রাখি। মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই কুর্তাটি পরিধান করেছিলেন। তখন আশপাশ থেকে দুই তিনজন মেহমান উপস্থিত হলে আমি এই লাল কালির চিহ্নটি সম্পর্কে তাদের সাথে কথা বলি। তারা তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট এসে বলেন, মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব আমাদের কাছে এমনটি বর্ণনা করেছে। হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ, একেবার সঠিক বলেছে। তখন তারা নিবেদন করে, হুযূর! এই কুর্তাটি আমাদের দিয়ে দিন। আমরা সবাই এটি ভাগাভাগি করে নিবো কারণ আমাদের সবার এতে অধিকার আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, ঠিক আছে, নিয়ে নিও। কিন্তু তাদেরকে কোন শর্ত দেন নি আর তাদের কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতিও নেন নি। তখন আমি অনেক ঘাবড়ে গেলাম এই ভেবে যে, নিদর্শনটি বোধহয় আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। আমি মনেমনে উদ্বিগ্ন হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিবেদন করলাম, হুযূর! এই কুর্তাটির ওপর আপনার আর কোন অধিকার নেই, কেননা এটি এখন আমার সম্পদ হয়ে গেছে। আমি এটি কাউকে দেই বা না দেই এটি সম্পূর্ণ আমার বিষয়। কেননা আমি হুযূরের নিকট থেকে এটি নিয়ে নিয়েছি। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ, এটি তো মিয়া আব্দুল্লাহ আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে আর তিনি এটি আপনাদের প্রদান করবেন কি না করবেন এটা নিতান্তই তার ব্যাপার। তখন তারা আমার নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এটি চাইলেও আমি না করে দেই। মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন, অদ্যবধি সেই কুর্তাটির মাঝে লাল চিহ্নটি কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই বিদ্যমান আছে। আর সেই কুর্তার কাপড়কে পাঞ্জাবি ভাষায় নেয়নো বলা হয়। এই কুর্তাটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাতদিন ধরে পরিধান করছিলেন। আমি প্রথমদিকে এই কুর্তাটি লোকজনকে দেখাতাম না, কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই কথাটি আমার স্পষ্ট মনে ছিল যে, এই কুর্তাকে কেন্দ্র করে যেন আবার মাজার তৈরি না হয়ে যায়। কিন্তু লোকেরা এটি দর্শনের প্রবল ইচ্ছা পোষণ করত। আর দর্শনের জন্য আমাকে খুবই বিরক্ত করত। আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা.)-কে বিষয়টি অবগত করি যে, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই কথাগুলোর কারণে লোকদের এই কুর্তাটি দেখাতে অপছন্দ করি কিন্তু লোকেরা এটিকে দর্শনের জন্য আমাকে খুবই উত্যক্ত করছে। এখন কি করব? হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা.) বলেন, এটিকে অনেক বেশি করে দেখাও। আর এত অধিকহারে দেখাও যেন এই কুর্তাটি স্বচক্ষে দর্শন লাভের সাক্ষী অনেক বেশি সংখ্যক লোক হয়। আর আমাদের জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তি যেন এটি বলে, আমিও দেখেছি, আমিও দেখেছি, আমিও দেখেছি। অথবা তিনি আমি এর স্থানে আমরা ব্যবহার করেছেন। এরপর থেকে আমি দেখানো শুরু করে দিলাম। কিন্তু এখনও শুধুমাত্র তাদেরই দেখাই যারা দেখার ইচ্ছা পোষণ করে। নিজ থেকে দেখানোকে আমি অপছন্দ করি। কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশগুলো আমার হৃদয়ে একেবারে গেঁথে আছে। আর প্রত্যেকটি সফরে আমি এই কুর্তাকে আমার সাথে রাখি, এই ভেবে, না জানি কখন মুত্যু এসে যায়। খাকসার নিবেদন করছি, আমি এই কুর্তাটি দেখেছি, লাল কালির চিহ্নটি হালকা অর্থাৎ গোলাপির মত ছিল। আর আমি মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব থেকে জেনেছি যে, প্রাথমিক অবস্থা থেকেই চিহ্নটি এমনই ছিল। (উদ্ধৃতি নম্বর ৪৩৬ দ্রষ্টব্য)... *(চলবে)*

দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, এই বছর পাক্ষিক **'আহমদী'** প্রকাশনার শতবর্ষ পূরণ হতে যাচ্ছে। সেই উপলক্ষে পাক্ষিক **'আহমদী'** বিশেষ সংখ্যা হিসেবে আগামী ১৫ জুলাই ২০২২ সংখ্যাটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে। তাই উক্ত বিশেষ সংখ্যায় লেখা দিতে আগ্রহীদের আগামী ১৫ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বরাবর– **সম্পাদক,** পাক্ষিক আহ্‌মদী
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

রমযানের জানা-অজানা

অনুবাদ: মাওলানা মসীহ্ উর রহমান

রোযা ও নিয়্যত

প্রশ্ন: রোযার জন্য নিয়্যত করা আবশ্যক?

উত্তর: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, রোযার জন্য নিয়্যত আবশ্যক। নিয়্যত ব্যতিত পূণ্য অর্জন হতে পারে না। হৃদয়ের সংকল্পকে নিয়্যত বলা হয়। পূর্ব আকাশে কালো রেখা থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে শুভ্র রেখা প্রকাশ পাওয়া অবধি খাবার খাওয়া বৈধ। যদি নিজের পক্ষ থেকে সাবধানতা থাকা সত্ত্বেও কেউ বলে যে, ঐ সময়ে শুভ্র রেখা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে তাহলে রোযা অবশ্যই হবে। মহানবী (সা.)-এর খাবার খাওয়া এবং ফযর নামাযের মাঝে ৫০ আয়াত তিলাওয়াতের সমপরিমাণ সময় থাকত।

কেউ যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কিছু না খেয়েই শুয়ে থাকে অথবা কোন কাজে এমন মগ্ন থাকে যে খাবারের কথা মনেই থাকল না তাহলে সে ব্যক্তির এই উপোস থাকাকে রোযা বলা ঠিক হবে না। কেননা তার রোযা রাখার কোন নিয়্যতই নেই। আর তার এই উপোস থাকা রোযা রাখার নিয়্যতে ছিল না।

প্রশ্ন: যদি সাহরীর সময় রোযার নিয়্যত না থাকে কিন্তু দিনের বেলা ১১ টার সময় রোযার সংকল্প করা হয় তাহলে তার রোযা হবে?

উত্তর: রোযার নিয়্যত সুবেহ সাদিকের পূর্বে করা জরুরী। যদি কোন বৈধ কারণ থাকে যেমন, আজ থেকে রমযান শুরু তা জানা ছিল না অথবা ঘুমিয়ে ছিল। সকালে ঘুম থেকে জাগার পর জানা গেল যে, আজ রোযা অথবা এমন ধরনের অন্য কোন কারণ যদি থাকে তাহলে সে দুপুরের আগে আগে সেই দিনের রোযার নিয়্যত করতে পারে। কিন্তু শর্ত হল সে যেন সুবেহ সাদিকের পর কিছু না খায়।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ফযরের পূর্বে দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে রোযার নিয়্যত করে শুধুমাত্র তারই রোযা হবে।

কিন্তু এর সাথে আরেকটি হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) মাঝে মাঝে ঘরে আসতেন আর জিজ্ঞেস করতেন যে, নাশতা করার জন্য কোন কিছু আছে? যদি কিছু না থাকত তাহলে তিনি (সা.) বলতেন ঠিক আছে আজকে আমি রোযা রাখব। *(মুসলিম কিতাবুস সওম)*

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আগে নিয়্যত না করার পিছনে যদি বৈধ কোন কারণ থাকে তাহলে দিনের বেলাও রোযার নিয়্যত করা যায়। যদিও মহানবী (সা.)-এর এই রোযা নফল রোযা ছিল।

একইভাবে আরেকটি হাদীসে আছে যে, একদা দুপুরের পূর্বে খবর আসে যে, রমযানের চাঁদ মদিনার কোন দূরবর্তী এলাকায় দেখা গিয়েছে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, যারা সকাল থেকে কিছু খাও নি তারা রোযার নিয়্যত করে নাও আর যারা খেয়েছে তারা পরে এই রোযা পূর্ণ করবে।

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি নফল রোযার নিয়্যত করে কিন্তু সাহরী খেতে পারে নি তাহলে সে কি রোযা রাখতে পারে?

রমযানের রাতে কেউ অসুস্থ থাকে আর ভোরে শরীর যদি ভাল হয়ে যায় তাহলে কি সে রোযা রাখবে?

ফরয রোযার ক্ষেত্রে যদি সাহরী না খেতে পারে তাহলে কি রোযা রাখা যাবে?

উত্তর: সাহরী খাওয়া সুন্নত, ফরয বা আবশ্যক নয়। তাই যদি কেউ সাহরী না খেতে পারে তাহলে সে রোযা রাখতে পারে। তার রোযা হবে না, এমন কোন বিষয় না।

যদি সাহরীর সময় শরীর ভাল থাকে তাহলে রোযা রাখা উচিত। রাতের বেলা রোযা রাখার নিয়্যত করার অর্থ হল, সুবেহ সাদিকের আগে আগে রোযা রাখার সংকল্প করা।

প্রশ্ন: সাহরী খাওয়া কি আবশ্যক?

উত্তর: সাহরী খাওয়া ব্যতিত রোযা রাখায় কল্যাণ নেই। কিন্তু অপারগতা বা বৈধ কারণ থাকলে সাহরী খাওয়া ছাড়া রোযা রাখা যেতে পারে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন,

সাহরী খাও কেননা সাহরী খাওয়ার মাঝে কল্যাণ রয়েছে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যারা সাহরী খায়, আল্লাহ্ তা'লা এবং তার ফিরিশতারা তাদের ওপর দরূদ পাঠায়।

আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পর রোযার নিয়্যত

প্রশ্ন: এক ব্যক্তির প্রশ্ন হল, আমি ঘরে বসে ছিলাম আর আমার বিশ্বাস ছিল যে এখনও রোযা রাখার সময় আছে। আর আমি কিছু খেয়ে রোযা রাখার নিয়্যত করি। কিন্তু পরবর্তীতে অন্য এক ব্যক্তি থেকে জানতে পারি ততক্ষণে আলো ফুটে গিয়েছিল। এখন আমার কি করা উচিত?

উত্তর: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এমতাবস্থায় তার রোযা হয়েছে। পরে আর রাখার দরকার নেই। কেননা নিজের পক্ষ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করেছিল আর তার নিয়্যতের মাঝে কোন কমতি নেই।

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, সুম্মা আতিম্মুস সিয়ামা ইলাল লাইল এই আয়াতে লাইল-এর আভিধানিক অর্থ কি এবং রোযার ইফতারি সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত কী?

উত্তর: অভিধানে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে সূর্যদয় পর্যন্ত সময়কে রাত বলা হয়। কিন্তু প্রচলিত সুন্নত এবং উম্মতের সম্মিলিত আমল থেকে এটি স্পষ্ট যে, উপর্যুক্ত আয়াতে পুরো রাত অর্থ নয়। বরং রাতের এক অংশে রোযা খুলতে হবে। এখন আমরা সেই অংশ নির্ধারণ করতে যদি কুরআনের বর্ণনার ওপর মনোযোগ দেই, তাহলে এটি রাতের শুরু অর্থাৎ সূর্যাস্ত নির্ধারিত হয়। কেননা ইলা শব্দ দ্বারা এটি বুঝায় যে, রোযা রাতের সূচনা অবধি রোযা রাখতে হবে। আর রাত শুরু হতেই ইফতার করে নিতে হবে। অতএব, হাদীসেও এই অর্থের প্রতি নির্দেশ করে।

মুসলিম শরীফ এবং বুখারী শরীফে উদ্ধৃত একটি হাদীস আছে যেখানে মহানবী (সা.) বলেন, ইযা আকবালাল লাইলু ওয়া আদবারান নাহারু ওয়া গাবাতিশ শামসু ফাকাদ আফতারাস সায়েমু। *(বুখারী কিতাবুস সওম)*

অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে যখন রাত ঘনিয়ে আসে এবং পশ্চিম দিকে দিন ধাবিত হয় অর্থাৎ সূর্য অস্ত যায় তখন রোযাদারের রোযা খোলা উচিত। একইভাবে বলেন, লা ইয়াযালুন নাসু বিখাইরিন মা আয্‌যালুল ফিতরা। *(বুখারী বাব তা'যিলুল আফতার)*

অর্থাৎ যতক্ষণ মানুষ দ্রুত ইফতার করতে থাকবে ততক্ষণ তাদের মাঝে কল্যাণ থাকবে। ইবনে মাজাহর হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা দেরি করে ইফতার করত। মুসলমানদের এমন করা উচিত নয়। *(ইবনে মাজাহ্, কিতাবুস সওম, বাব মা যায়া ফি তা'যিলুল আফতার)*

তিরমিজি শরীফে বর্ণিত আছে মহানবী (সা.) দ্রুত ইফতার করার বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। অতএব, এটি প্রচলিত সুন্নত এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'তের সকল আলেম এর ওপর আমল করে।

সফরে রোযা রাখা নিষেধ এবং এর কারণ

১। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সফরে রোযা রাখাকে আদেশ অমান্য করা আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, হুযূর (আ.) বলেন, রোগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তার ওপর আদেশ অস্বীকারের ফতোয়া বর্তাবে।

হুযূর (আ.)-এর এই মতামত কুরআনের আয়াত **"ফা ইদ্দাতুম মিন আইয়ামিন উখার"** এর ওপর ভিত্তি করে দেয়া। এবং হাদীসের সম্মিলিত বিবরণ থেকেও এই মতামতের সমর্থন পাওয়া যায়। রমযানে সফরে যে রোযা রাখে মহানবী (সা.) তাকে উছাতুন বলেছেন। যে হাদীসে ছাড় দেয়া সম্পর্কে জানা যায় ইমাম যুহরী এই হাদীসগুলোকে পূর্বের হাদীস বলেছেন। অতএব, সহীহ মুসলিম থেকে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়।

২। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বহিরাগত আহমদীদের জন্য কাদিয়ানকে দ্বিতীয় মাতৃভূমি আখ্যায়িত করেছেন। তাই তারা সেখানে থাকা অবস্থায় রোযা রাখতে পারে। আর রাখতে না চাইলেও বৈধ হবে।

৩। দ্বিতীয় মাতৃভূমির দিকে যাত্রা করাও সফর বলে গণ্য হবে। তাই রোযা রাখা বৈধ নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইফতারের পূর্বে কাদিয়ানে পৌঁছা ব্যক্তিদের রোযা ভাঙ্গিয়েছেন।

৪। যেসকল মানুষের চাকুরি সফরের সাথে সম্পর্কিত যেমন– রেলওয়ে গার্ড, ড্রাইভার, পাইলট, ট্রাভেল এজেন্ট প্রভৃতি ব্যক্তিরা সফরের আদেশের মাঝে গণ্য হবে না এবং তাদের রমযানের রোযা রাখা উচিত।

হযরত আকদাস (আ.) সফরে রোযা রাখা বিষয়ে আদেশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যদি রেলের সফর হয় এবং কোন ধরনের সমস্যা যদি না হয় তাহলে রোযা রাখতে পার। নতুবা খোদা তা'লার ছাড় থেকে উপকৃত হও।

প্রশ্ন: যদি কোন রোযাদারের সফর করার প্রয়োজন হয় তাহলে কি সে রোযা ভাঙ্গতে পারে?

উত্তর: রমযানের দিনগুলোতে যতদূর সম্ভব সফর থেকে বিরত থাকা উচিত এবং একদম অপারগ হলে সফরে যাওয়া উচিত। কোন সফর বেশি জরুরী তা স্বয়ং সফরকারীর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে। আর তিনিই একমাত্র আল্লাহ্‌র দ্বারা জিজ্ঞাসিত হবেন। অন্য কেউ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এছাড়া যে ধরনের সফরই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সফর চলবে ততক্ষণ রোযা রাখা উচিত না।

রোযা রেখে সফর শুরু করা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, সফরে রোযা রাখা বিষয়ে আমার মত হল, হতে পারে কোন কোন ফিকাহবিদ-এর সাথে দ্বিমত হতে পারেন– যে সফর সাহরীর পরে শুরু হয়ে সন্ধ্যায় শেষ হয়ে যায় তা রোযার ক্ষেত্রে

সফর বলে গণ্য হবে না। রোযার মাঝে সফর হবে কিন্তু সফরে রোযা হবে না।

প্রশ্ন: সফর অবস্থায় রোযা রাখা যাবে কি-না। কত মাইল সফর হলে রোযা রাখা উচিত নয়?

উত্তর: রমযানে সফরে রোযা রাখা উচিত নয়। যদিও রমযানের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষায় সর্বসম্মুখ্যে খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা উত্তম। সফর এবং দূরত্বের বিষয়ে কোন সীমা এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় নি। এটি মানুষের নিজ বিবেক ও সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সারমর্ম: সফরে রোযার চারটি ধরন হতে পারে।

১। পায়ে হেঁটে বা পরিবহনে যদি সফর অব্যাহত থাকে তাহলে রোযা রাখা উচিত নয়।

২। সফরে যদি কোন জায়গায় রাতে থামতে হয় এবং সুবিধা থাকে তাহলে রোযা রাখতে পারে। অর্থাৎ রোযা রাখা বা না রাখার দুটোরই অনুমতি রয়েছে। যদিও পুরো দিন সেখানেই অবস্থান করা হচ্ছে।

৩। সাহরী খাওয়ার পর ঘর থেকে যদি সফর শুরু হয় এবং ইফতারের আগে আগে যদি সফর শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ ঘরে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে তাহলে রোযা রাখতে পারে।

৪। কোথাও পনের দিন অথবা তার থেকে বেশি অবস্থান করতে হলে সেখানে সাহরীর ব্যবস্থা করে নিন এবং রোযা রাখুন।

অসুস্থ এবং মুসাফির

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং মুসাফির অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে সে আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট আদেশ অমান্য করে। আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, অসুস্থ এবং মুসাফির ব্যক্তি রোযা রাখবে না। অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়ার পর এবং সফর শেষ হওয়ার পর রোযা রাখুন। আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ মান্য করা উচিত। কেননা প্রকৃত মুক্তি কৃপা দ্বারা লাভ হয়। আর কোন ব্যক্তি নিজের কর্মের জোরে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা এটি বলেন নি যে, অল্প অসুস্থতা হোক বা বেশি অথবা সফর ছোট হোক বা বড়। বরং এটি একটি সার্বিক আদেশ। আর এটি মান্য করা উচিত। অসুস্থ ব্যক্তি এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তার ওপর আদেশ অবমাননার ফতোয়া বর্তাবে।

রোযা রাখার বয়স

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, অনেকেই আছেন যারা ছোট বাচ্চাদের রোযা রাখান। অথচ প্রত্যেক আদেশ ও আবশ্যকতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সীমা এবং ভিন্ন ভিন্ন সময় রয়েছে। আমার মতে কিছু আদেশের সময় চার বছর বয়স থেকে শুরু হয়। আর কিছু এমন আদেশ আছে যার সময় সাত বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত এবং কিছু এমন আছে যার সময় ১৫ অথবা ১৮ বছর থেকে শুরু হয়। আমার মতে রোযার আদেশ ১৫ থেকে ১৮ বছরের বালকের ওপর আরোপ হয়। আর এটাই সাবালক হওয়ার বয়স। ১৫ বছর বয়স থেকে রোযা রাখার অভ্যাস করা উচিত এবং ১৮ বছর বয়সে রোযা আবশ্যক হয়ে যায়। আমার মনে আছে, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমারও রোযা রাখার ইচ্ছা হত। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে রোযা রাখতে দিতেন না। তাই শিশুদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য এবং তাদের শক্তি বাড়ানোর জন্য তাদেরকে রোযা রাখা থেকে বিরত রাখা উচিত। এছাড়া যখন সে পূর্ণ শক্তি লাভ করে যা মূলত ১৫ বছরের সময় ,তখন তাকে দিয়ে রোযা রাখান। কিন্তু তাও নম্রতার সাথে। প্রথম বছর যতটা রাখবে দ্বিতীয় বছর তার থেকে বেশি রাখান। এভাবে ধাপে ধাপে তাকে রোযা রাখার অভ্যাস করান।

প্রসূতি, গর্ভবতী এবং শিক্ষার্থী

পবিত্র কুরআনে শুধুমাত্র অসুস্থ এবং মুসাফিরদের জন্য রোযা রাখার ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। প্রসূতি মা এবং গর্ভবতীর জন্য এরকম কোন আদেশ নেই। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে অসুস্থদের অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন। একইভাবে ঐসকল শিশুরাও অসুস্থতার অন্তর্ভুক্ত যাদের শরীর এখনও বিকাশ লাভ করছে অথবা ভগ্ন শরীর নিয়ে যারা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঐ দিনগুলোতে তাদের ব্রেনের ওপর এতটা চাপ থাকে যে কেউ কেউ পাগল হয়ে যায়। অনেকের শরীর খারাপ হয়ে যায়। অতএব, একবার রোযা রেখে সারাজীবনের জন্য বঞ্চিত হয়ে যাওয়াতে কী লাভ।

প্রশ্ন: যে সকল ছাত্ররা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তাদের রোযা রাখার ব্যাপারে আদেশ কি?

উত্তর: রোযার কারণে দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম পরিত্যাগ করার আদেশ দেয়া হয় নি। তাই যদি দৈনন্দিন কাজের কারণে রোযা রাখা কষ্ট হয় তাহলে এটাও অসুস্থতার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই বিষয়ে তার কাজের জন্য সে সম্পূর্ণ নিজে দায়িত্বশীল থাকবে। তার সাথে তার আল্লাহ্ তার নিয়্যত এবং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। কেননা নিজের অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়ে মানুষ নিজেই মুফতি।

যে ব্যক্তি রোযা রেখে অসুস্থ হয়ে যায় যদিও সে পূর্বে অসুস্থ ছিল না তার জন্য রোযা মাফ করা হয়েছে। তার এই অবস্থা যদি সবসময় থাকে তাহলে তার ওপর কখনও রোযা রাখা আবশ্যক হবে না। আর যদি কোন নির্দিষ্ট বছর এমন হয় তাহলে অন্য সময় এই রোযাগুলো রাখতে হবে। হ্যা তাকওয়ার সাথে চিন্তা ভাবনা করুন যাতে শুধু বাহানা বানানো না হয় বরং প্রকৃত অসুস্থতা হয়।

প্রশ্ন: মাঝে মাঝে রমযানে এমন সময় আসে যখন কৃষকদের অনেক বেশি কাজের চাপ থাকে। যেমন– জমি চাষ

করা বা ফসল কাটা। এমন শ্রমিক যাদের জীবিকা কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল যার কারণে তারা রোযা রাখতে পারে না। তাদের সম্পর্কে কী নির্দেশনা?

উত্তর: হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়্যত**– এসব মানুষ নিজেদের অবস্থা গোপন রাখে। প্রত্যেকে তাকওয়া ও পবিত্রতার সাথে নিজের অবস্থা বিশ্লেষণ করুন। যদি কোন দিনমজুর রোযা রাখতে পারে তাহলে সে রাখুক নতুবা সে-ও অসুস্থতার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে যখন সময় সুযোগ হবে তখন রাখবে। **আলাল্লাযিনা ইউতিকুনাহু** এর অর্থ হল যারা সামর্থ্য রাখে না।

এক বন্ধু হুযূর (আ.) কে জিজ্ঞেস করেন যে, ডায়বেটিস রোগীর জন্য রোযা রাখার বিষয়ে নির্দেশনা কি?

তার জবাবে হুযূর (আ.) বলেন, অসুস্থতায় রোযা রাখা বৈধ নয় এবং ডায়বেটিস রোগীর জন্য এটি অনেক ক্ষতিকর।

কতিপয় পুরোনো রোগ

কিছু কিছু রোগ এমন হয় যার মধ্যে মানুষ সকল কাজ করতে পারে। যেমন, পুরোনো রোগ। এর মাঝে মানুষ সব কাজ করতে থাকে। এমন মানুষ অসুস্থ বলে গণ্য হবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয় যে, ঐ ব্যক্তির সফর কি গণ্য হবে যে চাকুরিজীবী হওয়ার কারণে সফর করে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, তার সফর সফর বলে গণ্য হবে না। তার সফর করা তার চাকুরির অংশ। একইভাবে কিছু এমন রোগ আছে যার মাঝে মানুষ সকল কাজ করতে পারে। সৈনিকদের মাঝেও এমন আছে যারা এই রোগের শিকার হন কিন্তু তারা সব কাজ করতে থাকেন। মাঝে মাঝে আমাশয় হয়ে যায় কিন্তু এর কারণে সে সবসময়ের জন্য কাজ করা ছেড়ে দেয় না। অতএব, যদি অন্যান্য কাজের জন্য সময় বের হয় তাহলে কি কারণে এমন রোগী রোযা রাখতে পারবে না? এই ধরনের বাহানা কেবলমাত্র এই কারণে করা হয় যে তারা মুলত রোযা রাখার বিপক্ষে। সফরে এবং অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা উচিত নয়– নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের আদেশ। আর আমরা এই আদেশের ওপর গুরুত্ব দেই যাতে কুরআনের আদেশের অবমাননা না হয়। কিন্তু এই বাহানার সুযোগ নিয়ে যেসব মানুষ রোযা রাখতে পারে কিন্তু তবুও তারা রোযা রাখে না অথবা তার কিছু রোযা ছুটে যায় আর যদি সে চেষ্টা করতো তাহলে সেগুলো পূর্ণ করতে পারত, কিন্তু সেগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করে না। তাহলে এমন লোক তেমনভাবেই পাপের ভাগীদার হবে যেভাবে কেউ একদম রোযা না রাখার পাপ করে। তাই সকল আহমদীর উচিত, যত রোযা সে অলসতার কারণে অথবা কোন সিদ্ধ কারণে রাখতে পারে নি– সেগুলোকে যেন পূর্ণ করে।

অনেক ফিকাহবিদের মতামত হল আগের বছরের বাদ যাওয়া রোযা পরের বছর রাখা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় যদি কেউ অজ্ঞাত থাকার কারণে রোযা না রাখতে পারে তাহলে অজ্ঞাত কারণ মাফ হতে পারে। হ্যা যদি সে জেনে বুঝে রোযা না রাখে তাহলে এগুলো পূর্ণ করা যায় না। যেমন, জেনে বুঝে পরিত্যাগ করা নামায পূর্ণ হয় না। কিন্তু যদি সে ভুলে রোযা না রাখে অথবা অনিচ্ছাকৃত কোন ভুলের কারণে সে রোযা না রাখে তাহলে আমার মতামত হল, সে পরবর্তীতে রোযা রাখতে পারে।

ফিদিয়া রোযা রাখার সামর্থ্য অর্জনের কারণ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, একবার আমার মনে উদয় হল যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারন করা হল। এরপর আমি বুঝতে পারলাম এটি এই কারণে যে, এর মাধ্যমে রোযা রাখার সামর্থ্য অর্জন হয়। একমাত্র খোদা তা'লার সত্তাই সামর্থ্য দান করেন। আর সকল কিছু আল্লাহ্‌র নিকট চাওয়া উচিত। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যদি চান তাহলে একজন জ্বরাক্রান্তকেও রোযা রাখার সামর্থ্য দান করতে পারেন। এই কারণে এমন মানুষ যারা রোযা রাখা থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের দোয়া করা উচিত যে, হে আল্লাহ্ এটি তোমার এক পরম পবিত্র মাস আমি এটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আর কে জানে যে, আগামী বছর বাঁচবো কি না। কিংবা ছুটে যাওয়া রোযাগুলো রাখতে পারবো কিনা। তাই এর (ফিদিয়া) মাধ্যমে সামর্থ্য যাচনা করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এমন হৃদয়কে আল্লাহ্ শক্তি দান করবেন। যদি খোদা তা'লা চান তাহলে অন্য সকল উম্মতের মত এই উম্মতের জন্য কোন ফিদিয়া না রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি কল্যানের জন্য ফিদিয়া রেখেছেন। আমার মতে প্রকৃত বিষয় হল, যখন মানুষ বিশ্বস্ততা এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করে যে, এই মাসে আমাকে বঞ্চিত কর না তাহলে আল্লাহ্ তাকে কখনও বঞ্চিত রাখেন না। এমতাবস্থায় যদি রমযানে কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে এই অসুস্থতা তার জন্য অনুগ্রহস্বরূপ হবে কেননা সকল কাজ নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল। মু'মিনের উচিত, সে তার নিজ সত্ত্বাকে আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ় প্রমাণ করুক। যে ব্যক্তি রোযা থেকে বঞ্চিত থাকে কিন্তু হৃদয়ে বেদনার সাথে এই নিয়্যত রাখে যে, হায়! যদি আমি সুস্থ থাকতাম এবং রোযা রাখতাম! যদি তার হৃদয় এই বিষয়ে কষ্ট পায় তাহলে ফিরিশতা তার জন্য রোযা রাখবে, শর্ত হল সেটি যেন কোন বাহানা না হয়। তাহলে আল্লাহ্ কখনও তাকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখবেন না। এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয়। যদি কোন ব্যক্তি নিজ সত্তার অলসতার কারণে রোযা পরিত্যাগ করে এবং সে নিজে ধারণা করতে থাকে যে, আমি অসুস্থ, আমার শরীর এমন যে, যদি এক বেলা না খাই তাহলে অমুক অমুক সমস্যার অবশ্যই সম্মুখীন হই। আর এর ফলে এটি হবে। অতএব, এমন ব্যক্তি যে খোদার অনুগ্রহকে নিজের ওপর কাঠিন্য মনে করে, সে কবে এই পুণ্যের ভাগীদার হবে! হ্যাঁ যে ব্যক্তির হৃদয় এই বিষয়ে খুশি

যে, রমযান এসে গেছে এবং সে এটি আসার অপেক্ষায় ছিল যে, আমি রোযা রাখব। যদি অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে না পারে। তাহলে ঊর্ধ্বলোকে রোযার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। এই পৃথিবীতে অনেক লোক বাহানাবাজ হয়ে থাকে। আর সে মনে করে যেমনভাবে আমরা পৃথিবীবাসীকে ধোঁকা দিচ্ছি তেমনই আল্লাকেও ধোঁকা দিতে পারব কিন্তু এটি ঠিক না। লৌকিকতার দ্বার অনেক বিস্তৃত। যদি মানুষ চায় তাহলে সে এর মাধ্যমে সারা জীবন বসেই নামায পড়তে পারে। আর রমযানের রোযা একদমই না রাখতে পারে কিন্তু আল্লাহ্ তার নিয়্যত এবং সংকল্প সম্পর্কে জানেন। যার মাঝে বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠা আছে, আল্লাহ্ জানেন যে তার হৃদয়ে আত্মবেদনা আছে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাকে মূল পুণ্য থেকেও বাড়িয়ে দেন কেননা হৃদয়ের বেদনা এক মহামূল্যবান জিনিস।

ফিদিয়া

মানুষ যদি অসুস্থ থাকে আর যদি সেই অসুস্থতা বৈধ হয় অথবা এমন অবস্থা হয় যাতে রোযা রাখলে অবশ্যই অসুস্থ হয়ে পড়বে যেমন, গর্ভবতী অথবা প্রসূতি মহিলা অথবা এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি যার শক্তির ক্ষয় শুরু হয়েছে অথবা এমন ছোট শিশু যার শক্তি এখনও বিকশিত হচ্ছে তাহলে তার রোযা রাখা উচিত নয়। আর এমন মানুষ যদি সামর্থ্য লাভ করে তাহলে এক ব্যক্তির খাবার কাউকে দিয়ে দেয়া উচিত। অথবা যদি এই সামর্থ্য না থাকে তাহলে এমন ব্যক্তির নিয়্যতই আল্লাহ্‌র নিকট রোযার সমতুল্য।

যদি সাময়িক অসুস্থতা হয় এবং পরে সেরে যায় তাহলে ফিদিয়া দেয়া হোক বা না হোক রোযা অবশ্যই রাখা উচিত। কেননা ফিদিয়া দেয়ার ফলে রোযা মাফ হয়ে যায় না। এটি তো কেবল এই বিষয়ে পরিবর্তে দেয়া হয় যে, এই দিনগুলোতে অন্যান্য মুসলমানের সাথে মিলে এই ইবাদত করতে পারে নি অথবা এই বিষয়ের কৃতজ্ঞতা যে, আল্লাহ্ আমাকে এই ইবাদত করার সুযোগ দিয়েছেন। কেননা রোযা রেখে যে ফিদিয়া দেয় সে অনেক বেশি পুণ্যের ভাগিদার হয়। রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ করে খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত। আর যার রোযা রাখার বিষয়ে বৈধ কারণ আছে সে তার ঐ বৈধ কারণের জন্য ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে।

এরপর এই কারণ দুই ধরনের হয়ে থাকে– সাময়িক এবং স্থায়ী। এই দুই অবস্থাতেই ফিদিয়া দেয়া উচিত। এরপর যখন সমস্যা দূর হয়ে যায় তখন রোযা রাখা উচিত। মূলত, যদি কেউ ফিদিয়া দিয়ে দেয় কিন্তু এক বছর বা দুই বছর বা তিন বছর পর যখনই শরীর সুস্থ হবে যখনই সম্ভব হবে, রোযা রাখা উচিত। যদি কেউ সাময়িক অসুস্থতার পর সুস্থ হয় আর সে সংকল্প করে যে আজ রোযা রাখবো, বা কাল রাখবো এরকম করতে করতে তার শরীর স্থায়ীভাবে খারাপ হয়ে যায় তাহলে এমন অবস্থায় ফিদিয়া যথেষ্ট হবে না।

প্রশ্ন: রমযানে ফিদিয়া কার ওপর আবশ্যক? বৃদ্ধ, দুর্বল, স্থায়ী রোগী, গর্ভবতী, প্রসূতী প্রভৃতি যারা পরবর্তী রমযানে রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না তারাই কেবল ফিদিয়া দিবে। অথবা যে ব্যক্তি সাময়িকভাবে অসুস্থ থাকার কারণে কিছু রোযা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং রমযানের পর সুস্থ হয়ে গণনা পূর্ণ করার আশা রাখে আর গণনা পূর্ণ করে তার জন্য আবার ফিদিয়ার হার কি?

উত্তর: সাধারণত আদেশ হল, রোযাও রাখবে এবং যদি সাধ্য থাকে তাহলে ফিদিয়াও দিবে। রোযা রাখা আবশ্যক এবং ফিদিয়া দেয়া সুন্নত। এছাড়া রমযানে ফিদিয়া দেয়া তার জন্য আবশ্যক নয়, যে সাময়িক অসুস্থতার জন্য কিছু রোযা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র যদি সেই ব্যক্তি রোযা পূর্ণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করে। এমতাবস্থায় তার সন্তানদের জন্য আবশ্যক হল তার পক্ষ থেকে রোযার ফিদিয়া আদায় করে দেয়া অথবা ততগুলো রোযা রাখা।

রমযানে রোযার আবশ্যক ফিদিয়া কেবলমাত্র এমন সামর্থ্যবান মানুষের জন্য যাদের সম্পর্কে নিকট ভবিষ্যতে ঐ রোযা পূর্ণ করার আশা করা যায় না। যেমন, দুর্বল বৃদ্ধ অথবা স্থায়ী রোগী অথবা গর্ভবতী এবং প্রসূতী মা।

আল্লামা ইবনে রাশদ বাদায়াতুল মুজতেহাদাতে লিখেন, **আম্মা হুকমুল মুসাফির ইযা আফতারা ফাহুয়াল কাযায়ু বি ইত্তিফাকিন ওয়া কাযালিকাল মারিযু লি কাওলিহি তা'আ ফা ইদ্দাতুন মিন আয়্যামিন উখার।**

আল হামিলু ওয়াল মুরযিয়ু ইযা আফতারতা মাযা আলাইহিমা ওয়া হাযিহিল মাসয়ালাতু লিলউলামায়ু ফিহা আরবাতু মাযাহিব আহাদুহা ইন্নাহা ইউতয়িমানে ওয়া লা কাযায়া আলাইহিমা ওয়া হুয়া আন ইবনে আব্বাসিন।

অতএব, এই নীতিকে দৃষ্টি পটে রাখা উচিত। যদিও ইমাম আবু হানীফা এর পরিমান গমের ক্ষেত্রে আধা সা' অর্থাৎ পৌনে দুই সেরের কাছাকাছি বর্ণনা করেছেন। আর এটি একটি ছুটে যাওয়া রোযার ফিদিয়া হবে যা দুই বেলা খাবারের সমমূল্যের হবে।

এটি জরুরী নয় যে, ফিদিয়া কোন এমন গরীবকেই দিতে হবে যে রোযা রাখে। মূল উদ্দেশ্য, যোগ্য অসহায় ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো। যদিও সে নিজে রোযা রাখতে পারে। অথবা কোন কারণে নাও রাখতে পারে। এভাবেই তার ওপর ফিদিয়া আবশ্যক। যদি আদায়ের সামর্থ্য না থাকে তাহলে এক অসমর্থ্য ব্যক্তির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা, তওবা, ইস্তেগফার, দোয়া যিকরে এলাহী এবং ধর্মের সেবা করা যথেষ্ট হবে।

স্থায়ী মুসাফির এবং রোগী ফিদিয়া দিতে পারে

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) ৩০ অক্টোবর ১৯০৭ সালে বলেন, যেসব রোগী এবং মুসাফিরদের আশা নেই যে, আর কখনও সে রোযা রাখার সুযোগ পাবে। উদাহরণসরূপ একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ

দুর্বল মানুষ অথবা একজন দুর্বল গর্ভবতী মহিলা যে দেখে যে প্রসবের পর বাচ্চার দুধ পান করানোর কারণে সে পুনরায় দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং ঐ বছর তার এরকমই পেরিয়ে যাবে। এমন ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ঠিক নয় কেননা সে রোযা রাখতেই পারবে না আর এর বদলে সে ফিদিয়া দিবে।

প্রশ্ন: রোযা রাখার জন্য ফিদিয়াস্বরূপ যাকে অর্থ দিব তাকে আগেই কেউ একজন ফিদিয়ার অর্থ দিয়েছে। এক্ষেত্রে আদেশ কি?

উত্তর: কাউকে টাকা দিয়ে রোযা রাখানো যায় এই বিশ্বাস ভুল। মুল আদেশ হল যদি কোন ব্যক্তি দুর্বলতার কারণে রোযা না রাখতে পারে তাহলে সে প্রত্যেকটি রোযার পরিবর্তে কোন অভাবীকে দুই বেলার খাবার খাওয়াবে অথবা সেই খাবারের দাম পরিশোধ করবে। যে যোগ্য ব্যক্তিকে ফিদিয়া দেয়া হয়েছে তার জন্য এটি আবশ্যক নয় যে, এর বদলে তার জন্য রোযাও রাখবে। যদি সে অসহায় অসুস্থ হয়, বৃদ্ধ হয় অথবা নাবালগ হয় তাহলে সে রোযা রাখবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অসহায়ত্বের কারণে সে ফিদিয়া নেয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবে। যদিও যে ব্যক্তি কে ফিদিয়া দেয়া হয়েছে সে যদি রোযা রাখে তাহলে এই বিষয় বেশি পুণ্যের কারণ হবে। কিন্তু এই শর্ত আবশ্যক নয় যে, এটি ব্যতিত ফিদিয়া আদায় হতে পারে না।

জেনে বুঝে রোযা ভাঙ্গার কারণ

যে ব্যক্তি জেনে বুঝে রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে সে মহাপাপী। এমন মানুষের জন্য তওবা আবশ্যক। অর্থৎ তাকে ধারাবাহিকভাবে ৬০ টি রোযা রাখতে হবে। অথবা ৬০ জন অভাবীকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী খাবার খাওয়াতে হবে। অথবা প্রত্যেক অভাবীকে দুই সের গম বা তার দাম দিতে হবে। তওবার ধারাবাহিকতায় মূল বিষয় হল প্রকৃত অনুশোচনা– যা হৃদয়ের গভীরে সৃষ্টি হয়। যদি এই অবস্থা মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় কিন্তু তার ৬০ টি রোযা রাখার বা ৬০ জন দরিদ্র মানুষকে খাওয়ানোর সামর্থ্য নেই তাহলে তার উচিত আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং অনুগ্রহের ওপর ভরসা রাখা। এমতাবস্থায় তার জন্য ইস্তেগফার করাই যথেষ্ট হবে। হাদীসে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর কাছে আসে এবং কসম দিতে লাগে যে হুযূর আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। মহানবী (সা.) বলেন, কি কারণে তুমি ধ্বংস হয়ে গেছ? সে জবাব দেয় যে, হুযূর আমি রোযা অবস্থায় নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। হুযূর (সা.) বলেন, তুমি কি দাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখো? সে বলে জ্বী না। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, ধারাবাহিকভাবে ৬০টি রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, জ্বী না। যদি এমন হত আর আমি জৈবিক উদ্দিপনা প্রতিরোধ করতে পারতাম তাহলে এই ভুল কেনই বা করতাম। মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে ৬০ জন অসহায় অভাবীকে খাবার খাইয়ে দাও। সে বলল, আমার অবস্থা এমন করার মত না। মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে তুমি বসো। এর মাঝে এক ব্যক্তি এক ঝুড়ি খেজুর নিয়ে আসে। তিনি (সা.) বলেন, এখান থেকে খেজুর নাও এবং অভারীদের খাইয়ে দাও। ঝুড়ি নিয়ে সে বলে, আমার থেকে বেশি অভাবী কে? পুরো মদিনায় আমি সব থেকে বেশি দরিদ্র। মহানবী (সা.) তার এই অনুরোধে হেসে উঠেন এবং বলেন, যাও নিজের পরিবার পরিজনকে খাইয়ে দাও।

প্রশ্ন: রমযান মাসে এক ব্যক্তি যে রোযা রাখে নি সে যদি তার এমন স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় যে রোযা রেখেছে এবং সে নিজের কথা স্বামীকে বলেও দিয়েছে। এক্ষেত্রে আদেশ কী?

উত্তর: স্ত্রীর রোযা ভেঙ্গে যাবে। যদি তার ইচ্ছায় না হয় তাহলে এক্ষেত্রে তার কোন শাস্তি হবে না। হ্যাঁ! সে এই রোযা পরে কখনও রাখবে। তবে তারও যদি ইচ্ছা থেকে থাকে তাহলে তার কাফফারা হিসেবে ৬০টি রোযা রাখতে হবে অথবা ৬০ অভাবীকে খাওয়াতে হবে এবং যেহেতু স্বামী দোষী তাই তাকে তওবা এবং ইস্তেগফার এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার করতে হবে আর কাফফারাও দিতে হবে।

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি তীব্র পিপাসার্ত থাকার কারণে রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে কি তাকে কাফফারা দিতে হবে?

উত্তর: যদি কেউ তীব্র পিপাসার কারণে বাধ্য হয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে এর জন্য পরবর্তীতে রোযা পূর্ণ করা আবশ্যক। যদিও এক্ষেত্রে কাফফারা আবশ্যক না। কাফফারা কেবল এমন ক্ষেত্রে আবশ্যক যখন মানুষ বিনা কারণে এবং বাধ্য হয়ে জেনে বুঝে রোযা ভেঙ্গে ফেলে। এমন অবস্থায় তার জন্য আবশ্যক হল, সে যেন এই ভুলের কাফফারা দেয়। অর্থাৎ দুই মাস টানা রোযা রাখবে অথবা যদি তার সামর্থ্য না থকে তাহলে ৬০ জন অভাবীকে খাবার খাওয়াবে।

প্রশ্ন: জানতাম আজকে ঈদ। সকাল আটটায় নাস্তা করে যখন ঈদগাহে গেলাম জানলাম ঈদ আগামীকাল। আমি তখন থেকে রোযার নিয়্যত করলাম। সন্ধ্যা অবধি কিছু খেলাম না। আমার কি রোযা হবে?

উত্তর: রোযার জন্য আবশ্যক হল সুবেহ সাদিকের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন কিছু না খাওয়া এবং রোযার নিয়্যত করা। যেহেতু দিনের সময়ে আজ রোযা না ভেবে খাবার খাওয়া হয়েছে তাহলে গুনাহ হবে না কিন্তু রোযাও হবে না। তাই পরবর্তীতে এটি পূর্ণ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন: রোযাদারের জন্য কি সবধরনের টিকা দেয়া নিষেধ? রোযাদার কি সরকারি বিভিন্ন টিকা নিতে পারবে?

উত্তর: যখন আল্লাহ্ তা'লা এই সুযোগ দিয়েছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ থাকে তাহলে সে রমযানের পর সুস্থ হয়ে রোযা

রাখবে। তাহলে এরপরও এমন কি বাধ্যবাধকতা যে রমযানে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখবেন। যদি অসুস্থ অথবা ডাক্তারকে রোগের প্রতিরোধের জন্য টিকা লাগাতে হবে অথবা সরকার কোন রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা দিচ্ছে এবং পরবর্তীতে সুযোগ হবে না। এমন সকল ক্ষেত্রে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি আছে। অতএব, রোযা থাকা অবস্থায় টিকা লাগানোর প্রশ্নই আসে না।

তেমনইভাবে বর্ণনা অনুসারে চামড়ার টিকা যেমন বসন্তের টিকার জন্য রোযা ভাঙ্গে না। যদিও ইনজেকশন যেমন ইন্ট্রা মাসকুলার অথবা ইন্ট্রাভেনাস টিকায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। তেমনই রক্ত গ্রহণেও রোযা ভেঙ্গে যাবে।

যেসব বিষয়ে রোযা ভাঙ্গে না

১। মেসওয়াক করায়, চোখে ড্রপ দেয়া, ঘ্রাণ নেয়া, ঢোক গেলায়, ময়লা আবর্জনা গলায় চলে গেলে রোযা ভাঙ্গবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সুরমা সম্পর্কে বলেছেন, দিনে লাগানো (মাকরুহ তথা) অপছন্দনীয়। হাদীসের ভাষ্যও এমনই।

একইভাবে সিঙ্গা লাগানো, বমি করলে, ছোটখাটো অপারেশেন করলে, সুগন্ধি বা ক্লোরোফরম শুকলে রোযা ভাঙ্গে না। যদিও এগুলো পছন্দ করা হয় না। তাই এ বিষয়গুলো মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। এছাড়া কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, সুগন্ধি দেয়া, মাথায় বা দাড়িতে তেল দেয়া, বারবার গোসল করা, আয়না দেখা, মালিশ করা, ভালবাসার অতিসহ্যে চুমু দেয়া, এগুলোর মাঝে কোনটি নিষেধ নয়। আর এ কারণে রোযাও ভাঙ্গে না। এছাড়া এগুলো অপছন্দনীয় না। একইভাবে ফরয গোসল আবশ্যক থাকা সত্ত্বেও যদি গোসল করা সমস্যা হয় তাহলে গোসল ছাড়াই খাবার খেয়ে রোযা রাখতে পারে।

প্রশ্ন: রোযা রেখে টুথপেস্ট ব্যবহার করা এবং আঘাতে তরল আয়োডিন লাগানোর ব্যাপারে আদেশ কি?

উত্তর: টুথপেস্ট ব্যবহার করা (মাকরুহ তথা) অপছন্দনীয়। যদিও এমনই মেসওয়াক বা ব্রাশ করা এবং কুলি করা বৈধ। বহিঃঅঙ্গে তরল ঔষধ লাগানো যেতে পারে।

প্রশ্ন: নাকের ড্রপে রোযা ভাঙ্গে কি না?

উত্তর: রোযা অবস্থায় নাকে ড্রপ দেয়া (মাকরুহ তথা) অপছন্দনীয়।

রোযা রেখে ভুল করে কিছু খাওয়া

যদি স্মরণ না থাকে আর মানুষ ভুলে কিছু খেয়ে নেয় তাহলে তার রোযা আগের মতই ঠিক থাকবে। আর তার রোযার কোন ধরনের ক্ষতি হবে না। বরং এমন অবস্থায় উত্তম হল, যদি কেউ ভুল করে খাওয়া শুরু করে তাহলে পাশের কেউ তাকে স্মরণ করাবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাকে খাওয়াচ্ছেন। এতে কারও বাধা দেয়ার কি দরকার। হাদীসে আছে– মহানবী (সা.) বলেছেন,

কোন রোযাদার যদি ভুল করে কিছু খেয়ে নেয় তাহলে তার চিন্তিত হয়ে পড়া উচিত নয়। এটি আল্লাহ্‌র রিযক যা আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন। আর এক্ষেত্রে তার রোযা আবার রাখতেও হবে না আর কাফফারাও দিতে হবে না। যদি কেউ ভুলে রোযা ভাঙ্গে যেমন– রোযার কথা স্মরণ ছিল কিন্তু সুর্যাস্ত হয়েছে ভেবে ইফতার করে নিয়েছে আর পরে জানতে পারলো যে, এখনও সূর্য অস্ত যায় নি তাহলে এমন অবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে আর এই রোযা পুনরায় রাখতে হবে। কিন্তু এই ভুলের কারণে তার পাপ হবে না আর কাফফারাও দিতে হবে না।

প্রশ্ন: কোন দুর্ঘটনায় অসুস্থ ব্যক্তিকে রক্ত দেয়াতে রক্তদান কারীকে রোযাদারের রোযা ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর: কেবল মাত্র রক্ত দেয়ায় রোযা ভাঙ্গে না। কিন্তু যেহেতু এমন করায় শারীরিক দুর্বলতা তৈরি হয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা উচিত। রক্ত দেয়া যেহেতু মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য অনেক সময় গুরত্বপূর্ণ হয়ে থাকে এবং রোযা পরবর্তীতেও রাখার অনুমতি আছে। আর আল্লাহ্ এই সুযোগ দিয়েছেন তাই আগে রক্ত দেয়া প্রয়োজন। যারা কেবলমাত্র রোযার কারণে মানবসেবা থেকে বিরত থাকে তারা প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে পারে না।

প্রশ্ন: রমযানে বাদ যাওয়া রোযা পরবর্তীতে কি ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে নাকি বিরতি দিয়ে রাখা যাবে?

উত্তর: যদি সফর বা অসুস্থতার কারণে রোযা বাদ যায় তাহলে পরবর্তীতে সেগুলো রাখতে হবে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে রাখা আবশ্যক নয়, বিরতি দিয়েও রাখা যাবে।

(তথ্যসূত্র: ফিকাহ আহমদীয়া)

Smile Aid
your complete dental healthcare
Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces
Oral & Dental Surgery | Teeth Whitening
Dental Fillings | Dental Implant
Root Canal Treatment | Orthodontics (Braces)
Dental Crowns, Bridges | In-House Dental X-RAY
Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital–DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka – 1212
Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid
Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471
Consultant
Holy–Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

বিবাহ সংবাদ

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"আল্লাহ্ তোমাকে আশিসের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশিস বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

▪ গত ২৯/১২/২০২১ আম্বিয়া খাতুন, পিতা: আবুল বাসার, বড় ভেটখালী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামপুর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ সোহেল আহমেদ, পিতা: মোহাম্মদ আব্দুল আলীম, ভেটখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০৫১**

▪ গত ১৬/০২/২০২২ ইশরা নাশিতাত, পিতা: মরহুম মাহমুদ হাসান সিরাজী, ৪০ চট্টেশ্বরী রোড, চট্টগ্রাম-এর সাথে মোহাম্মদ ফিরোজ আহমেদ, পিতা: মরহুম মোকাদ্দেস বিশ্বাস, ৩ জে জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫, আমেরিকা-এর বিবাহ ১১,০০,০০০/= (এগারো লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০৫২**

▪ গত ০৯/০২/২০২২ মোছাঃ হিমা আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ হান্নান মিয়া, দোসাইদ, পো: আশুলিয়া, থানা: আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-এর সাথে ওয়াজিম উদ্দীন চৌধুরী, পিতা: মরহুম রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, ভাদুঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/= (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০৫৩**

▪ গত ১৮/০৩/২০২২ মোছাঃ বর্নালী খান বর্না, পিতা: হারুন-অর রশীদ খান, পূর্বগ্রাম, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে সুলতান আহমদ চৌধুরী, পিতা: মরহুম ডা. আতাউর রহমান চৌধুরী, জামালপুর, শাকির মোহাম্মদ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ-এর বিবাহ ৫০০,০০০/= (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০৫৪**

▪ গত ১১/০২/২০২২ জান্নাতুল বাকী প্রীতি, পিতা: মরহুম দুলাল মিয়া, হাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম রবিন, পিতা: মরহুম খোরশেদ আলম, উত্তর সালনা, গাজীপুর-এর বিবাহ ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০৫৫**

▪ গত ১৯/১২/২০২১ মোছাঃ রিফাত জাহান রিমু, পিতা: রিপন আহম্মদ, ভাতগাঁ, পঞ্চগড়-এর সাথে বিপ্লব হোসেন, পিতা: সোহেল আহমদ, উত্তর বাড্ডা, পশ্চিম, পদরদিয়া মসজিদ রোড, ঢাকা-এর বিবাহ ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/০৫৬**

সংবাদ

মজলিসে শুরার সিদ্ধান্তের আলোকে মালী কুরবানী বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৯ জানুয়ারী ২০২২ তারিখ বাদ মাগরিব বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদে মালী কুরবানী বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুরআন তিলাওয়াত এবং নযমের পর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মালী কুরবানীর গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন মাওলানা সাব্বির আহমদ, মালী কুরবানী সম্পদ বৃদ্ধি ও জান্নাত লাভের উপায় বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখনী ও সাহাবাগণের দৃষ্টান্তের আলোকে মালী কুরবানীর গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন মাওলানা মারুফ আহমদ। সভা শেষে মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করানো হয়। উপস্থিত ছিলেন আনসার ২১ জন, আতফাল, ১৭ জন, খোদ্দাম ৫ জন, লাজনা নাসেরাত ১৩ জনসহ সর্বমোট ৫৬ জন।

কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আলোকে আমরা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি চেয়ে পত্র দিয়েছিলাম। সাড়া না পেয়ে স্থানীয়ভাবে আলোচনা সভার আয়োজন করি। এছাড়াও আমাদের মাসিক তরবিয়তী সভায় এ বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা হচ্ছে।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার, *আমীর*
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ভাতগাঁও জামা'তে নিশানে আসমানী পুস্তক বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০১/০৪/২০২২ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ নামাযের পর ভাতগাঁও মসজিদে নিশানে আসমানী পুস্তকের সেমিনার ও গত কয়েক বছরে খোদ্দামুল আহমদীয়া হতে ১৩ জন আনসারুল্লাহ পদার্পন ও অন্য মজলিস হতে আগত ২ জন আনসারসহ মোট ১৫ জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মদ আব্দুর রউফ নায়েব রিজিওনাল আযেমে আলা ও রিজিওনাল অডিটর মজলিস আনসারুল্লাহ্, রংপুর রিজিওন ও যয়ীম মজলিস আনসারুল্লাহ্, ভাতগাঁও। পবিত্র কুরআন অর্থসহ তিলাওয়াত করেন শওকত আহমেদ, রামপুর। বাংলা নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ মুক্তার হোসেন শাষন, ভাতগাঁও। নিশানে আসমানী পুস্তকের পটভূমি আলোচনা করেন এইচ এম সোহরাওয়ার্দী সেক্রেটারি অডিটর। নিশানে আসমানী পুস্তকের ওপর আলোচনা করেন মোজাফ্ফর আহমেদ রাজু, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। আনসারদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রেসিডেন্ট ভাতগাঁও। সমাপ্তি বক্তব্য ও আহাদ পাঠ করান মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, নায়েব রিজিওনাল নাযেমে আলা ও রিজিওনাল অডিটর মজলিস আনসারুল্লাহ্, রংপুর রিজিওন। দোয়া পরিচালনা করেন মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, ভাতগাঁও। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আসাদুজ্জামান সোহেল বাবু। উপস্থিতি আনসার ২৩ জন, অন্যান্য ১৭ জনসহ মোট ৪০ জন।

মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, *যয়ীম, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ভাতগাঁও*

কবিতা

স্বাধীন বাংলাদেশ

মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ

ধন্য হয়েছি, ধন্য করেছ
মহান করেছ আমায়,
শত পুষ্প ছড়িয়ে দিলে তুমি
হে মাটি! আমায় করেছ ধন্য।
কান্নার জোয়ারে বয়েছিল নদী
রক্তের মিলন তাতে
কে জানিত স্বাধীনতার বীন
বাজিবে তোমার বুকে।
পথে-প্রান্তরে মাঠে ও ঘাটে
শিয়াল, শুকুনের পালা
কি বেদনায় কাটায় প্রহর
যায় না, কাটে না বেলা।
শষ্য-শ্যামল সোনার বাংলায়
কতই না ঝরেছে প্রাণ
স্বাধীনতা তবু ছিনিয়ে এনেছি
রেখেছি তোমার দান।
ধরার মাঝে স্ব-স্ব সাজে
কতই না নিশান উড়ে
তারই মাজে রক্তে রাঙ্গা
বাংলার ঝংকার বাজে
ডুকরে কেঁদেছি ভাই বিয়োগে
হারিয়ে মায়ের সম্ভ্রম।
অশ্রু ঝরে কপল বেয়ে
শুনি যবে স্বাধীনতার গান।
রক্ত দিয়েছি স্বাধীন করেছি
রাখি বধি, সবে অম্লান
দেব না হারাতে শির যবে রবে
এসে আজ বীর বাঙালী কবি ফরমান।
গৌরব রেখে মাথা উঁচু করে
ধরায় দাঁড়াবে বল কোন দেশ
লাখো শহীদের রক্তে গড়া
আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ।

****

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে সে বিরত থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপদৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

৩

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনাব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

৪

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৬

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।

৭

অহংকার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

১০

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ তথা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে অথবা তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ: ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ইং)

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. **(Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200**
২. **Chelidonium Q (Mother tincture)**

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

MTA-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

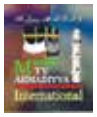

MTA-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) **শুক্রবার:** বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০ সরাসরি সম্প্রচার।** পুনঃপ্রচার **রাত ১০:২০** এবং **ভোর ৪:০০।**

(২) **শনিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সকাল ৮:১০** এবং **বিকাল ৫:০০।**

(৩) **রবিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০।**

(৪) **বৃহঃবার:** একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **রাত ৮:০০।**

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

STUDIO JUNCTION ENTERTAINMENT REIMAGINED

Find us on STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি
বি. ডি. এস (ঢাকা),
পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার ঃ
ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন),
পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময়:
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা (মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা **হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)**-এর কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রের সংকলন-এ

"বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ"

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (ইংরেজি পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে।

পুস্তকটির অনুবাদের কাজটি করেছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক। প্রথম সংস্করণের অংশে আরো যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বর্ণিত আছে। বইটির অনুবাদ, কম্পোজ, সম্পাদনা, প্রুফ-রিডিং, মুদ্রণ প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কার দান করুন। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)